Vol. 40 | No. 2 | 1997

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মীর মশাররফ হোসেন বিরচিত 'বিষাদসিন্ধু'র ঐতিহাসিকতা

Volume	40
Issue	2
Year	1997
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোশাররফ হোসাইন ভূঁইয়া
Published online	February 1, 1996
DOI	10.62328/sp.v40i2.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v40i2.7
Pages	119-144
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মীর মশাররফ হোসেন বিরচিত 'বিষাদসিন্ধু'র ঐতিহাসিকতা

মোশাররফ হোসাইন ভুঁইয়া

অবতরণিকা :

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাচর্চায় যে কয়জন মুসলিম সাহিত্য সাধক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন নিঃসন্দেহে সর্বাধিক খ্যাতিমান। 'বিষাদসিন্ধু' তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থ। ছোট বড় প্রায় ৪২ খানা গ্রন্থের রচনাকার মীর সাহেবের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি কোনটি এ প্রশ্নে মতভেদ থাকলেও তাঁর খ্যাতি যে প্রধানত 'বিষাদসিন্ধু'র জন্যই একথা সর্বজনবিদিত। 'বিষাদসিন্ধু'র সংবেদনশীল কাহিনী আর বিস্ময়কর রচনাশৈলী বাঙালী পাঠকসমাজে তাঁকে অবিসংবাদী প্রতিষ্ঠা দান করেছে এবং দুদীর্ঘকাল তা অম্লান রয়েছে। মোটকথা 'বিষাদসিন্ধু' মশাররফ হোসেনকে কালজয়ী করেছে।

'বিষাদসিন্ধু'র সাহিত্যিক মান ও শৈল্পিক মানসের এ যাবৎকাল অসংখ্য আলোচনা-পর্যালোচনা এবং গবেষণা হয়েছে। কিন্তু এর মাঝে নিহিত ঐতিহাসিকত্ব আজ পর্যন্ত কেউই স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে পরিমাপ করেননি। পাঠকসমাজে গ্রন্থটি পাঠকালে এর কাহিনীতে নিহিত ঐতিহাসিক সত্য ঘটনার সাথে বর্ণিত বিপুল অলৌকিক ও অনৈতিহাসিক বিষয়াবলী দ্বারা ধর্মীয় ও মানবিক ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে অঝোরে অশ্রু বিসর্জন করে থাকে। সাহিত্যের পরিমণ্ডলে তা স্বাভাবিক হলেও ধর্ম ও ইতিহাসের মাপকাঠিতে তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। আবার সমালোচকবৃন্দ এর মাঝে ঐতিহাসিক অংশ আর অনৈতিহাসিক অংশের উপর ঢালাওভাবে মন্তব্য করবার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু ইতিহাসের তুলাদণ্ডে এটিকে সঠিকভাবে যাচাই করবার অবকাশ পাননি। 'বিষাদসিন্ধু'র এ বিশেষ তৎপর্যপূর্ণ দিকটি উন্মোচন করা আলোচ্য প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

'বিষাদসিন্ধু'র রচয়িতার সাহিত্যকর্মসহ সংক্ষিপ্ত জীবনী আলেখ্য ঃ

মীর মশাররফ হোসেন ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৩ নভেম্বর মোতাবেক ২৮শে কার্তিক ১২৫৪ সালে কুষ্টিয়া জেলার (তৎকালীন নদীয়া) কুমারখালীর নিকটস্থ লাহিনীপাড়া

গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ঐতিহ্যবাহী সৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃকুল ফরিদপুরের পদমদীর জমিদার সৈয়দ বংশের হলেও রাজদত্ত খেতাব 'মীর' নামেই সুপরিচিত। লাহিনীপাড়া হচ্ছে তাঁর মাতুলালয়। মশাররফ স্বগৃহে মুনশীর কাছে আরবী-ফারসী এবং পাঠশালায় পণ্ডিতের কাছে বাংলা শেখেন। স্বগ্রামের জগমোহন নন্দীর পাঠশালা, কুমারখালীর ইংরেজী-বাংলা মিশনারী স্কুল, পদমদীর নবাব স্কুল, কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে তিনি লেখাপড়া করেন। কিন্তু কোথাও বিদ্যাচর্চা বেশি দূর অগ্রসর হয়নি। সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়েছিলেন।[২]

মশাররফ হোসেন ছাত্রজীবন থেকে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। কুমারখালীর 'গ্রামবার্তা' সম্পাদক হরিনাথ মজুমদার ওরফে কাঙ্গাল হরিনাথ, ঈশ্বরগুপ্তের 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক রামচন্দ্র গুপ্ত আর ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন তাঁর সাহিত্যগুরু। উপর্যুক্ত পত্রিকা দুটোতে লিখেই মীর মশাররফ হোসেন হাত পাকান।[৩] গ্রাম্য মুন্‌শী ওস্তাদজীর সাহচর্যে এসে বেশ কিছু ফার্সী কবিতা বয়াত আয়ত্ত করেন এবং মাঝে মাঝে তিনি বয়াত বহাসে অংশ নিতেন। এছাড়া সেকালে বহুল প্রচলিত মুসলিম পুঁথিসাহিত্যের প্রতিও তিনি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুসলমান লেখকেরা এক ধরনের মিশ্র ভাষায় ইসলামের ইতিহাস, মুসলিম জীবন এবং নানারূপ কিংবদন্তি অবলম্বনে কাব্যকাহিনী রচনা করতেন। জৈগুনের পুঁথি, সোনাভান, আমীর হামজা, প্রভৃতি পড়ে তিনি নিজেই পরবর্তীকালে লিখেছেন, "পুঁথি পড়ার এতদূর অভ্যাস হইল যে, কোন পুঁথি আর আটকায়না, সকল পুঁথিই যেন আমার পড়া"।[৪]

তিনি কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতায় গিয়ে কালীঘাট স্কুলে ভর্তি হওয়ার নাম করে পিতৃবন্ধু নাদের হোসেনের গৃহে অবস্থানকালে তাঁর জেষ্ঠাকন্যা সুন্দরী ও বিদুষী লতিফুন্নেসার প্রেমে পড়ে যান। কিন্তু ঘটনাচক্রে পিতার অজ্ঞাতসারেই নাদের সাহেবের দ্বিতীয়া কন্যা অসুন্দরী ও বিদ্যাহীনা আজিজুন্নেসার সাথে তাঁর বিয়ে হয়ে যায়·(১৮৬৫)। এ বিবাহ সুখের হয়নি। বিবাহ উপলক্ষে নাদের হোসেনের পারিবারিক ষড়যন্ত্র, লতিফুনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও হোসেন আলী মিয়ার মত বৃদ্ধের কাছে সপত্নীগৃহে তার বিবাহ, বিবাহের আটদিন পর তার করুণ মৃত্যু, বিবাহ মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে পিতার অর্থসংক্রান্ত মনোভাব ইত্যাদি ট্রাজেডি মশাররফের ব্যক্তিগত ও সাহিত্যজীবনে বেশ রেখাপাত করেছিল। পরবর্তীকালে 'বিষাদসিন্ধু'র বর্ণনায় এ সবের প্রতিফলন আঁচ করা যায়।

তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'রত্নবতী' প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে। অতঃপর ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে পর পর 'গোরাইব্রীজ' বা 'গৌরীসেতু' কাব্যগ্রন্থ এবং 'বসন্তকুমারী' ও 'জমিদার দর্পণ' নাটকদ্বয় প্রকাশিত হয়। প্রথম বিবাহের আট বছর পর তিনি সাঁওতার সাধারণ কৃষককন্যা মাতৃহীনা কালী ওরফে কুলসুমকে বিবাহ করেন (১৮৭৪ খ্রি.)। এ বিবাহের মাত্র একমাস পরে তিনি প্রথমা স্ত্রীর নামানুসারে আজিজুননেহার নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন।[৫] সপত্নীবাদের বহ্নি শিখা থেকে দাম্পত্য জীবনের সুখশান্তিকে রক্ষার একটি কৌশল হিসেবে তিনি হয়তো এ আপোস ফর্মুলা প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাতে সফল হননি। জ্যেষ্ঠাপত্নী ভয়ঙ্কররূপ ধারণ করেন। এমনকি তিনি বিবি কুলসুমকে ধরাধাম থেকে সরাবার ষড়যন্ত্র করলে সৌভাগ্যবশত তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। সপত্নীবাদের এ তিক্ত অভিজ্ঞতাই 'বিষাদসিন্ধু'র মানব চরিত্রের রহস্য উন্মোচনে তাঁকে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। মশাররফ দ্বিতীয় দাম্পত্য-জীবনের সুখের কথা এবং তাঁর সাহিত্যিক জীবনের বিকাশে কুলসুমের অবদানের কথা বিবি কুলসুম (১৯১০ খ্রি.) গ্রন্থে স্বীকার করেছেন।[৬] ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে মীর মশাররফ হোসেন টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার এস্টেটের ম্যানেজার পদে যোগদান করেন। দ্বিতীয়াপত্নী কুলসুমকে তিনি সেখানে নিয়ে যান। একদিকে স্ত্রীর সেবা ও উৎসাহ, অপরদিকে জমিদার করিমুন্নেসার সাহিত্যানুরাগ, তাঁদের পারিবারিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ, ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সহানুভূতি দেলদুয়ারে মশাররফ হোসেনের উন্নত ও সৃজনশীল সাহিত্যসৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। এখানেই তিনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি 'বিষাদসিন্ধু' রচনা করেন। তাঁর অন্যান্য রচনাবলীর মধ্যে 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৯০), 'গাজী মিয়ার বস্তানী' (১৮৯৯) গ্রন্থদ্বয়ও বেশ উন্নত মানের। কাজী আবদুল মান্নান 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'-কে মীরের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি বলে মনে করেন।[৭] মুহম্মদ আবদুল হাই বলেন, 'বিষাদসিন্ধু' নয়, 'গাজী মিয়ার বস্তানীই মীরের শ্রেষ্ঠ রচনা।[৮] কিন্তু মুনীর চৌধুরীর মতে 'বিষাদসিন্ধু'ই মীর মশাররফ হোসেনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।[৯] জীবনের শেষ দিকে 'ইসলামের গৌরব' ও ইতিহাস অবলম্বনে 'ইসলামের জয়', 'মদীনার গৌরব', 'হযরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ', 'হযরত বেলালের জীবনী', 'হযরত আমীর হামজার ধর্মজীবন লাভ', 'বিবি খোদেজার বিবাহ' ইত্যাদি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তবে সমালোচকদের মতে এসবে পূর্ববৎ সাহিত্য ও শৈল্পিক প্রতিভা লক্ষ করা যায় না। মীর মশাররফ হোসেন ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ নভেম্বর পদমদীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।[১০]

'বিষাদসিন্ধু'র জনপ্রিয়তা ও গুরুত্ব :

'বিষাদ সিন্ধু'র বিস্ময়কর যাদুকরী রচনাগুণ মশারফ হোসনের ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তার কারণ। বস্তুত, এ কারণেই দীর্ঘকাল যাবৎ সমগ্র দেশব্যাপী পাঠক সাধারণের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা অম্লান রয়েছে। এ দেশে পাঠক সমাজে জনপ্রিয়তার বিচারে দুটি পুস্তক তুলনাহীন। একটি গদ্যশিল্পী মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু', আরেকটি সাহিত্যরত্ন নজিবর রহমান প্রণীত 'আনোয়ারা' (১৯৪১ খ্রি.)।[১১] তবে 'আনোয়ারা' সামাজিক উপন্যাস হিসেবে সমাদৃত হলেও 'বিষাদসিন্ধু' ছিল আরো অধিক কিছু। হিন্দুসমাজে 'রামায়ণ', 'মহাভারতের' মতো মুসলমান-সমাজেও মহর্রম তথা কারবালা কাহিনী বহুল প্রচারিত। এ গ্রন্থে হৃদয়বিদারক বিষাদময় ঘটনার সঙ্গে মুসলমানদের ধর্মীয় সংস্কারবোধ ইত্যাদি সংযোজিত হওয়ায় পাঠকদের হৃদয় আবেগায়িত করে তোলে। হযরত মুহাম্মদ (সা), তাঁর কন্যা হযরত ফাতেমা (রা), জামাতা হযরত আলী (রা) এবং প্রাণপ্রিয় দু-দৌহিত্র হযরত হাসান-হোসাইন (রা)-এর নাম বি ড়িত 'বিষাদসিন্ধু'-র সামগ্রিক করুণ কাহিনী তৎকালীন অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বাঙালী মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় আবেগের সাথে মিশে গেছে। কোরান শরীফ, বোখারী শরীফ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের ন্যায় 'বিষাদসিন্ধু'ও ঘরে ঘরে গিলাফবন্দী অবস্থায় শোভা পেত। এর শোকগাঁথা তাদের পরাধীনতার গ্লানিরও দ্যোতনা হয়ে দাঁড়ায়। সমসাময়িক কালের পত্র-পত্রিকাসমূহে হিন্দুসমাজেও 'বিষাদসিন্ধু' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা হয়েছে। সময়ের প্রেক্ষাপটে 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' মন্তব্য করে, "মুসলমানদিগের গ্রন্থ এরূপ বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ মহররমের আমূল বৃত্তান্ত 'বিষাদসিন্ধু'র গর্ভপূর্ণ হইয়া নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। ইহার এক একটি স্থান এরূপ করুণরসে পূর্ণ যে পাঠকালে চক্ষে পানি রাখা যায় না"।[১২] চারুবার্তার মতে, "এ গ্রন্থের লেখকের লিপিশক্তি অতি মনোহর। তাঁর লিখার গুণে একবারও মনে হয়নি যে কোন অপরিচিত বৈদেশিক ঘটনা ও আচার ব্যবহারের কথা এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থের উপসংহারভাগ এমন করুণ রসে পূর্ণ যে পাঠ করে কেউ অশ্রু সংবরণ করতে পারবেন না। এর ভাষা বিশুদ্ধ, লালিত্যপূর্ণ"।[১৩] ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল লাইব্রেরীর বার্ষিক রিপোর্টে লাইব্রেরিয়ান হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বিষাদসিন্ধু'-র উদ্ধার পর্ব সম্পর্কে মন্তব্য করেন: "Mir Mosharraf Hossain's Bishad Sindhu, based on the events before and after the great battle of Karbala is one of the best works in the Bengali language. The earthness and pathos of the works its elevated moral tone and dignified diction, raise it to a high

level and mark a distinct departure, both in matter and in manner from the current example of imaginative writing in Bengali. [১৪] 'বঙ্গবাসী' বলেন, "যেরূপ সুললিত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় গ্রন্থখানি রচিত তাহাতে হোসেন সাহেবকে বাহাদুর বলিতে হয়"।[১৫] 'ভারতী' মন্তব্য করেন, "ইতিপূর্বে একজন মুসলমানের এত পরিপাটি বাঙ্গালা রচনা আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না"।[১৬] প্রায় সকল সমালোচক একমত যে, মুসলমান হয়েও মশাররফ হোসেন বাংলা ভাষায় যেরূপ অনবদ্য অধিকার লাভ করেছেন তা অত্যন্ত প্রসংশনীয়। এটি বিশুদ্ধ ও সুরুচিপূর্ণ বাংলা গ্রন্থ। 'বিষাদসিন্ধু'র ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এর সঙ্গীতময়তা। গদ্য ভাষার অন্তর্লীন সঙ্গীত প্রবাহ গ্রন্থটিকে কাব্য সৌন্দর্য দান করেছে। গ্রন্থটির জনপ্রিয়তার আর একটি মানবিক কারণ এই যে, এর কাহিনীতে জয়নাবের রূপে বিমোহিত এজিদ এবং এ রূপতৃষ্ণার পরিণামে বহু মানুষের বিপর্যয় ও ধ্বংসের যে কথকতা বর্ণিত হয়েছে তা গ্রন্থটিকে সার্বজনীন করে তুলেছে।

'বিষাদসিন্ধু'র কাহিনী : [১৭]

বাঙালী মুসলমানের নিকট 'বিষাদসিন্ধু'র জনপ্রিয়তার একটি বিশেষ কারণ গ্রন্থটির কাহিনীগত দিক। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র হাসান-হোসেনের বিষাদময় মৃত্যুকাহিনী স্বভাবতই মুসলমানদের অন্তরকে গভীরভাবে শোকাভিভূত করে তোলে। এজন্যই বাংলাদেশে এক সময়ে জঙ্গনামা শ্রেণীর মর্সিয়া সাহিত্য শিয়া-সুন্নী নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। মশাররফ হোসেন এ কাহিনীর সর্ববিস্তারী আবেদন সৃষ্টির সামর্থ্য সম্পর্কে একেবারেই সজাগ ছিলেন। আর তাই তিনি গ্রন্থের একটি বিজ্ঞাপনে পাঠক সমাজের উদ্দেশ্যেই বলেছেন, "আজ সেইদিন-ওহে আজ সেই দিন, মুসলমান জগতের সেই চিরস্মরণীয় দিন। কারবালা প্রান্তরে যে হৃদয়বিদারক লোমহর্ষক ঘটনা ঘটিয়া মুসলমান জগতের নরনারীর চোখে জল ঝরাইয়াছে, অদ্যও ঝরিতেছে। চারিদিক হইতে কানে আসিতেছে হায় হোসেন! হায় হোসেন! সেই মহর্রমের ১০ তারিখে 'বিষাদসিন্ধু' আপনাদের হস্তে অর্পণ করিলাম"।

'বিষাদসিন্ধু'-র কাহিনী তিন দফায় প্রকাশিত। প্রকাশকাল যথাক্রমে ১লা মে, ১৮৮৫ খ্রি., (প্রথম খণ্ড— মহ্‌রম পর্ব), ১৪ই আগস্ট, ১৮৮৭ খ্রি., (দ্বিতীয় খণ্ড- উদ্ধার পর্ব) ও ১০ই মার্চ ১৮৯১ খ্রি. (তৃতীয় খণ্ড— এজিদ বধ পর্ব)। মহরম পর্বে ছাব্বিশ প্রবাহ, উদ্ধার পর্বে ত্রিশ প্রবাহ এবং এজিদ বধ পর্বে পাঁচটি প্রবাহ আর

উপক্রমণিকা ও উপসংহার মিলে সর্বমোট তেষট্টি অধ্যায় দীর্ঘ সাত বছর ধরে রচিত ও পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণটি লেখক উৎসর্গ করেছিলেন দেলদুয়ারের জমিদার শ্রীমতি করিমুন্নেসা খাতুন সমীপে। এর প্রথম থেকে অষ্টম সংস্করণের মধ্যে তিনি গ্রন্থের অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন।[১৮]

(১) গ্রন্থের উপক্রমণিকায় একটি দৈববাণী ঘোষিত হয় যা হযরত মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর শিষ্য মাবিয়া (রা)-কে বিচলিত করেছিল। ফিরিশতা জিব্রাইল (আ) মহানবীকে বলে যান যে তাঁর প্রিয়শিষ্য মাবিয়ার পুত্র কর্তৃক তাঁর প্রিয় দৌহিত্রদ্বয় নিহত হবে। সকলের সাথে মাবিয়া বিষণ্ন হয়ে পড়েন। তদবধি অবিবাহিত মাবিয়া দারপরিগ্রহ না করার প্রতিজ্ঞা করলেও দৈবচক্রে তাঁকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। তাঁর সন্তান এজিদই পরবর্তীকালে হজরতের দৌহিত্রদ্বয়কে হত্যা করে।

(২) পরবর্তী সংস্করণে উপক্রমণিকা ভিন্নরূপে রচিত। একদা ঈদের দিনে হযরতের দুই দৌহিত্র হাসান সবুজ রঙের পোশাক আর হোসেন লাল রঙের পোশাক পছন্দ করলে তৎক্ষণাৎ জিব্রাইল উপস্থিত হয়ে দৈববাণী করেন যে, হাসান বিষক্রিয়ায় এবং হোসেন হযরতের এক শিষ্যের সন্তান কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হবে। মাবিয়া হাসান-হোসেনের সাথে এজিদের নিদারুণ হৃদয়বিদারক ঘটনা এড়াবার জন্য সুদূর দামেস্ক নগরে বসবাস করতে থাকেন। এদিকে নবীজী তাঁর কন্যা বিবি ফাতেমা, জামাতা মহাবীর আলী একে একে হাসান হোসেনকে রেখে পরপারে বিদায় নিয়ে যান। দামেস্ক নগরে এজিদ বয়ঃপ্রাপ্ত হলে ঘটনা শুরু হয়ে যায়।

মহরম পর্বের প্রথম প্রবাহ থেকে বর্ণিত হয় যে দামেস্ক অধিপতি মাবিয়ার একমাত্র পুত্র এজিদ জয়নাব নাম্নী জনৈকা বিবাহিতা মহিলার প্রেমে উন্মাদ হয়ে পড়ে। এজিদ মাতার সমর্থনে মন্ত্রী মারোয়ানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে জয়নাবের স্বামী আব্দুল জব্বারকে মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে স্ত্রী পরিত্যাগে বাধ্য করে। কিন্তু জয়নাব এবার হাসানকে পতিত্বে বরণ করেন। এজিদ দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে হাসানকে নির্মূল করার প্রতিজ্ঞা করেন। মাবিয়ার মৃত্যুর পর এজিদ দামেস্কের সিংহাসনে আরোহণ করে মদীনার খলিফা হাসানকে বশ্যতা স্বীকারের দাবী জানায়। কূটনীতি এবং যুদ্ধে ব্যর্থ হয়ে তিনি ভিন্ন কৌশল অবলম্বনে তৎপর হন এজিদের মন্ত্রী মারোয়ান মায়মুনা নাম্নী এক কূটনী বৃদ্ধা মহিলাকে কার্যসিদ্ধির জন্য নিয়োজিত করেন। এ মহিলার প্ররোচনায় হাসানের দ্বিতীয়া স্ত্রী জায়েদা বিষ প্রয়োগে হাসানকে হত্যা করে। সবার অলক্ষ্যে জায়েদা এজিদের রাজ-দরবারে পুরস্কারের আশায় গিয়ে মৃত্যুদণ্ড লাভ করে। হাসানের মৃত্যুর পর এজিদের পরবর্তী কাজ হলো হোসেনকে হত্যা করা। ঊনবিংশ প্রবাহ থেকে তাই বিবৃত হয়। ছদ্মবেশী মারোয়ানের সলা-পরামর্শে হোসেন হযরতের সমাধিস্থল মদীনা পরিত্যাগ করেন। কুফার শাসনকর্তা

সর্বত্র। ফলে পৃথিবীর সকল ভাষাতেই রাসূল (সা)-এর জীবনচরিত রচিত হয়েছে। বাংলা ভাষাও এর পশ্চাৎপদ নয়। এজন্য রাসূলের (সা) জীবনীকারদের তালিকা খুবই দীর্ঘ। তাই মারগোলিয়াথ বলেছেন, *The Biographers of the prophet Mohammad from a long series, it is impossible to end but is which it would be honourable to find a place.* অর্থাৎ, মুহাম্মদের জীবনীকারকদের দীর্ঘ ফিরিস্তি রয়েছে। এটা গুনে শেষ করা অসম্ভব, তবে সে-ফিরিস্তিতে নিজের স্থান করে নেয়া গৌরবের ব্যাপার।[৫০]

যাহোক বাংলাভাষায় সীরাত সাহিত্যের সূচনাকাল থেকে এর ক্রমবিকাশ পর্যন্ত ধারাবাহিকতা ঐতিহাসিক সূত্রে অক্ষুণ্ন রয়েছে এবং থাকবে।

তথ্য নির্দেশ

১ Thomas Patrick Hughes, *A Dictionary of Islam*, Premier Book House, Anarkali, Lahore. 1964, P. 596

২ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) হলেন বিশ্বনবী। বিশ্বজনীন তাঁর আদর্শ। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ আদর্শের অধিকারী। হযরত মুহাম্মদ (সা)-ই একমাত্র প্রেরিত পুরুষ যাঁর প্রচারিত ধর্ম ও জীবনাদর্শ পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে। আল্লাহ বলেছেন, *আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণতা দান করলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামতকে পূর্ণ করলাম এবং ধর্ম হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করলাম।* (আল কুরআন-৫:৩)। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পূর্ববর্তী প্রেরিত পুরুষগণ বিশেষ কাল ও বিশেষ জাতির পথপ্রদর্শক হিসেবে পৃথিবীতে এসেছিলেন। হযরত নূহ (আ)-এর ভিতরে সতর্ককরণ ও প্রচার উদ্দীপনা, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর তাওহীদ প্রচারে ত্যাগ-তিতিক্ষা, ইসমাঈল (আ)-এর কুরবানী, মূসা (আ)-এর মাঝে বিরামহীন প্রচেষ্টা, যুদ্ধ এবং রাজকীয় শাসন শৃঙ্খলা, ইয়াকুব (আ)-এর জীবনে ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা, ইউসুফ (আ)-এর জীবনে চারিত্রিক দৃঢ়তা ও রাষ্ট্রীয় আমানত রক্ষা এবং ঈসা (আ)-এর জীবনে নম্রতা, কোমলতা ও উদারতা, এভাবে খণ্ডিত প্রজ্জ্বল আদর্শ পাওয়া যায়। পূর্ণাঙ্গভাবে নয়। তবে তাঁরা নবুওয়াত ও সত্যবাদীতার গুণাবলীতে পরিপূর্ণ ছিলেন তাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই।

৩ আল কুরআন, ২১:১০৭

৪ আল কুরআন, ৩৩:২১

৫ #Michael H. Hart, The 100, A ranking of the most influential Persons in history, Shelhart Publications, 1978
#P.K. Hitti বলেছেন, *Judged only by achievement, Muhammad the man, the teacher, the orator, the author, the stateman and the warrior stands out as one of the Ablest man in all history.* (P.K. Hitti, *Islam a Way of Life*, London, Oxford University Press, 1970. P. 43.)

৬ সৈয়দ আলী আহসান, 'প্রসঙ্গ কথা' গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী', আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৭, জিন্দাবাহার, প্রথম লেন, ঢাকা-১১০০, পৃ. ৮

৭ Sir William Muir, *The Life of Mohammad,* Edin burgh, John wrant, 1912, Introduction. P.P.XX-XXIX

৮ সৈয়দ আলী আহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৯ সৈয়দ আলী আহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

১০ সৈয়দ আলী আহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

১১ কে, এম, রইছ উদ্দীন খান, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানী, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৩৭

১২ হাসান জামান, *সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি*, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০, পৃ. ২১২
ড. মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সুফী প্রভাব*, কলিকাতা, ১৯৩৫

১৩ ক্ষিতিশচন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা*, (১ম খণ্ড), কলিকাতা, ১৯৭০, পৃ. ১৮-১৯

১৪ সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যে ইসলাম*, ঐতিহ্য ১ম বর্ষ, মার্চ-জুন সংখ্যা ১৯৮৬, পৃ. ৯

১৫ হাসান আব্দুল কাইয়ুম, বাংলা সাহিত্যে প্রিয়নবী, সীরাতুন্নবী স্মরণিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০৭ হি., পৃ. ৩৬-৩৭

১৬ দিল আফরোজ কাজী, *বাংলা ভাষায় বিদেশী প্রভাব*, এম,ফিল, অভিসন্দর্ভ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯, পৃ. ১৯

১৭ ভাষাতত্ত্ব/বাংলা ভাষার উৎপত্তি, প্রদর্শনী, ১৯৯২ জাতীয় যাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা।

১৮ মুহাম্মদ সিদ্দিক খান, *বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৭১, পৃ. ২১

আবদুল্লাহ জেয়াদের আমন্ত্রণক্রমে তিনি কুফা অভিমুখে রওয়ানা হন। পূর্বাহ্নে হোসেন মোসলেম নামক তাঁর এক চাচাতো ভাইকে দূত হিসেবে কুফায় প্রেরণ করেন। মোসলেম তাঁর দু নাবালক পুত্র-সন্তানকে নিয়ে কুফা যান এবং সেখানকার অনুকূল পরিস্থিতির সংবাদ অবহিত করে হোসেনকে কুফায় আগমনের জন্য পত্র লেখেন। ইতিমধ্যে কুফার লোকদের বিশ্বাসঘাতকতায় মোসলেমকে হত্যা এবং তাঁর দু-পুত্রের করুণ পরিণতির বিবরণে ত্রয়োবিংশ প্রবাহ সমাপ্ত হল। এ প্রবাহে হারেস নামক এক কুফাবাসী নরপিশাচ কিভাবে কুফাধিপতির পাঁচ হাজার মোহর পুরস্কার লাভের আশায় মোসলেমের দু-নাবালক পুত্রের শিরোচ্ছেদে বাধা প্রদানের কারণে প্রথমে নিজের দু-পুত্র পরে স্ত্রীকে হত্যা করে, তারপর ছেলে দুটির শিরোচ্ছেদ করে কুফার রাজদরবারে উপস্থিত হলে কুফার শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ জেয়াদ নৃশংস লোভী হারেসের প্রাণদণ্ড দেয়।

মোসলেমের পত্র পেয়ে হোসেন সপরিবারে কুফা অভিমুখে রওয়ানা হন; কিন্তু ভুলক্রমে অনুচরবর্গসহ কারবালায় পৌঁছেন। সেখানে এজিদের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন। তারা হোসেন-শিবিরে ফোরাত নদীর পানি সরবরাহও বন্ধ করে দেয়। শেষ পরিণতির কথা ভেবে পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ যুদ্ধক্ষেত্রেই হোসেন-কন্যা সখিনাকে হাসানের পুত্র কাসেমের নিকট বিবাহ দেয়া হয়। এজিদের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে হোসেনের সঙ্গীরা পরাজিত হন এবং একমাত্র অসুস্থ পুত্র জয়নুল আবেদীন ব্যতিরেকে কাসেমসহ সকল পুরুষ বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করে নিহত হন। হোসেনের শিশুপুত্র আসগর পানির পিপাসায় ছটফট করতে থাকলে হোসেন তাকে কোলে করে পানির আশায় এগিয়ে যান; কিন্তু তার বক্ষে শর বিদীর্ণ হলে রক্তাক্ত লাশ এনে স্ত্রী সহরবানুর কোলে দেন। সর্বস্বান্ত হোসেন শেষ পর্যন্ত নিজেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং অসংখ্য শত্রু নিধন করে শেষ পর্যন্ত সীমার কর্তৃক নৃশংসভাবে নিহত হন। ইমাম হোসেনের খণ্ডিত মস্তক নিয়ে সীমার ঊর্ধ্বশ্বাসে দামেস্ক অভিমুখে রওয়ানা হয়। আর এখানেই মহররম পর্ব সমাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড বা উদ্ধার পর্বে হোসেন-পরিবারের অন্যান্য লোকজন কিভাবে রক্ষা পায় এবং হানিফা কর্তৃক কিভাবে প্রতিশোধ নেওয়া হলো তারই বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথম প্রবাহে লেখক মারওয়ানের অপবিত্র হাতের স্পর্শ হতে রেহাই পাবার জন্য শোকাচ্ছন্ন হোসেন-দুহিতা সখিনা কাসেমের শবদেহের কটিদেশ থেকে খঞ্জর খুলে নিয়ে নিজ বুকে বিদ্ধ করে আত্ম-বিসর্জনের করুণচিত্র বর্ণনা করেন। দ্বিতীয় প্রবাহে সীমার হোসেনের খণ্ডিত শির নিয়ে আজর নামে এক অমুসলমান ব্যক্তির বাড়িতে রাত্রিযাপনের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করে। আজর হোসেনের শির তার হাতে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করে এবং একে একে দুপুত্র

এবং সে নিজে আত্মবিসর্জন দেয়। আজরের স্ত্রীও হোসেনের মস্তক রক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আত্মবিসর্জন করলেন। সীমার হোসেনের মস্তক নিয়ে দামেস্ক গমন করে। হোসেনের অসহায় পরিবার পরিজনদেরকেও বন্দী করে দামেস্কে নেওয়া হয়। এজিদ এ খণ্ডিত মস্তক নিয়ে হাসানের বিধবা স্ত্রী, সেই জয়নাব আর রুগ্ন ছেলে জয়নাল আবেদীনসহ বন্দী অসহায় পুরনারীদের নানাবিধ বিদ্রূপ করতে থাকলে অলৌকিকভাবে উপরের দিকে উঠে মস্তকটি অদৃশ্য হয়ে যায়। এদিকে কারবালা প্রান্তরে ইমাম হোসেনসহ শহীদদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার একটি দৃশ্যে লেখক ফেরেশ্‌তা জিব্রাইল, স্বীয় পত্নী ফাতেমাসহ শেরে খোদা আলী মোর্তজা এবং নবী রাসুলগণকে এনে উপস্থিত করেন।

অতঃপর এজিদ জয়নাল আবেদীনকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করার চেষ্টা চালান। কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয়ে এজিদ তাঁকে বন্দী করে রাখেন। হোসেনের বৈমাত্রের ভ্রাতা মোহাম্মদ হানিফা ছিলেন আম্বাজের অধিপতি। তিনি মদীনবাসীদেরকে সাথে নিয়ে এজিদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। সীমার, ওতবে ওলীদ, মারোয়ানসহ একে একে এজিদের সেনা-সেনাপতিরা মৃত্যুবরণ করতে লাগল। হানিফা দামেস্ক আক্রমণ করলে জয়নাল আবেদীন বন্দীখানা থেকে মুক্ত হয়ে হানিফার সঙ্গে মিলিত হলেন। মহাবীর হানিফার ভয়ে এজিদ পলায়ন করে। এ পর্যন্ত উদ্ধার পর্বের কাহিনী।

'বিষাদ সিন্ধু'র তৃতীয় খণ্ড হচ্ছে এজিদবধ পর্ব। এতে বন্দীশালায় বন্দীদের দুর্দশা চিত্রিত হয়েছে। হানিফা দামেস্ক নগরে উপনীত হলে বিজয় ডঙ্কার তালে তালে প্রতিশোধের আগুন জ্বলতে থাকে। প্রহরীরা পলায়ন করে। পাইকারি হত্যাযজ্ঞের মাঝে বহু নিরপরাধ ব্যক্তিকেও হত্যা করা হয়। বন্দীদেরকে উদ্ধার করা হয়। হানিফা এজিদকে ধরার নিমিত্ত পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে এক পর্যায়ে দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তরে অলৌকিকভাবে প্রাচীরবেষ্টিত হয়ে আবদ্ধ হয়ে রইলেন এবং রোজকেয়ামত পর্যন্ত দুলদুল সাথে রণবেশে তথায় বন্দী হয়ে অবস্থান করবেন। আর এজিদও ভূগর্তস্থ এক প্রকোষ্ঠে দৈবাগ্নিতে দগ্ধ হতে থাকবে। উপসংহারে লেখকের মন্তব্য এই যে, এভাবেই পরিণামে পাপীদের শাস্তি হয়। এজিদের সমস্ত অহমিকা ধূলিসাৎ হয়ে জয়নাল আবেদীন রাজ্য লাভ করেন। আর এভাবেই ইনসাফের জয় ঘোষিত হয়।

কারবালার প্রকৃত ইতিহাস :

কারবালা যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস উপলব্ধি করতে হলে দু প্রতিপক্ষ ইমাম হোসাইন আর খলিফা ইয়াযিদের পূর্বপুরুষগণের মধ্যকার প্রাক-ইসলামী যুগ থেকে চলে

আসা বিরোধের একটি ঐতিহাসিক পটভূমি তুলে ধরা একান্ত আবশ্যক। এ পটভূমিসহ কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনার ঐতিহাসিক বিবরণটি তুলে ধরার জন্য যে কয়খানি প্রামাণ্য গ্রন্থের উপর নির্ভর করা হয়েছে সেগুলো হলো : সৈয়দ আমীর আলী প্রণীত *A Short History of the Seracens*, London, 1949, সৈয়দ খোদা বক্সের *A History of Islamic Peoples*, C.U. 1914, পি, কে, হিট্টির রচিত. *A History of the Arabs*, London 1951, মুইর প্রণীত *The Caliphate and its Fall*, London, 1891, আর, এ নিকলসনের *A Literary History of the Arabs*, C.U. 1930, এবং মাওলানা আবুল কালাম আজাদ রচিত 'ইনসানিয়াত মউতকে দরওয়াজে পর' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ (নুরুদ্দীন আহমদ, 'মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা', সংশোধিত সংস্করণ, ১৯৭৬, ঢাকা)। মুইর তাবারী ও বালাজুরীর ইতিহাসের উপর নির্ভর করেছেন। ফলে আলোচ্য ঘটনার বিবরণে এ দু-প্রসিদ্ধ আরব ঐতিহাসিকের প্রভাব বিদ্যমান।

কারবালার নৃশংস ঘটনার প্রকৃত ইতিহাস ভালভাবে বুঝার সুবিধার্থে এর ঐতিহাসিক পটভূমির সংক্ষিপ্ত ধারণা একান্ত আবশ্যক। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মুহাম্মদ (সা)-এর জন্মের পূর্ব থেকেই কোরাইশ বংশের আরদ মানাফ শাখার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বনী হাশিম ও বনী উমাইয়া গোত্রের মধ্যে বিদ্বেষের বহ্নিশিখা বংশপরম্পরায় সংক্রমিত হয়ে তাদের জীবনধারাকে অশান্তিময় করে তুলেছিল। উমাইয়া ছিলেন হাশিমের ভাই আব্দ শামসের পুত্র। হাশিমের অত্যধিক প্রভাব প্রতিপত্তি ভ্রাতুষ্পুত্র উমাইয়াকে খুবই পীড়া দিত। উমাইয়া সর্বদা পিতৃব্য হাশিমকে হেয় করবার প্রচেষ্টা চালাতেন। একদা স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য তিনি তৎকালীন আরবের প্রথানুযায়ী এক প্রকাশ্য সভা আহ্বান করেন। শর্তারোপ হল যে, প্রতিযোগিতার পণ হবে পঞ্চাশটি কৃষ্ণচক্ষুবিশিষ্ট উট এবং মক্কাভূমি থেকে দশ বৎসরের জন্য নির্বাসন। প্রতিযোগিতায় বিচারকমণ্ডলী হাশিমকেই শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করলে ক্রুদ্ধ-উমাইয়া দশ বৎসরের জন্য সিরিয়ায় চলে গেলেন। তাঁর প্রদত্ত পঞ্চাশটি উট জবাই করে হাশিম মক্কাবাসীদিগকে বিরাট জিয়াফতে পরিতুষ্ট করলেন। এতে নির্বাসিত উমাইয়ার ক্রোধের জ্বালা আরো বেড়ে গেল। তবে এ নির্বাসনের সুবাদে সিরিয়ার সাথে তাঁর বংশের যোগসূত্র স্থাপিত হল।

উমাইয়ার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র হারব উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার প্রতিহিংসা আয়ত্ত করলেন এবং হাশিম পুত্র আবদুল মুত্তালিবের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে লাগলেন। আবদুল মুত্তালিব পিতার সদগুণরাজির অধিকারী হয়েছিলেন। হাশিমের ন্যায় তিনিও রাজোচিত উদারতা ও সমারোহের সাথে তীর্থকারীদের সেবা করতেন। হারব মুত্তালিবের সাথে প্রকাশ্য প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে মুত্তালিব

গোত্রের সংশ্রব বর্জন করলেন। এভাবে জ্ঞাতি বিদ্বেষের বিষাক্ত ধারা বংশানুক্রমে উমাইয়াদের সন্তান-সন্ততির ভেতর সংক্রামিত হয়। ৫৭০ খ্রি. ২৯শে আগস্ট হাশিমের পুত্র আবদুল মুত্তালিবের কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহ্‌র ঔরসে হজরত মুহাম্মদ (সা) জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-মাতা ও পিতামহের ইন্তেকালের পর অত্যন্ত আন্তরিকভাবে তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব পালন করেন পিতৃব্য আবু তালিব। হযরতের নবুয়তের পর পৌত্তলিক আরববাসীদের নিকট ইসলাম প্রচারকালে তীব্র বাধা ও নির্যাতনের মাঝে আবু তালিব নিজে ইসলাম গ্রহণ না করলেও তাঁর পুত্র আলী কৈশোরেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হযরতের নিত্যসহচর হিসেবে নবী ও ইসলামের সেবায় নিজেকে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে নিয়োজিত করেন। হযরত আলী ইসলামের ঘোর দুর্দিনে শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করেন এবং বিদ্যাবুদ্ধিতে একজন আদর্শবান পুরুষ হিসেবে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেন। মহানবী তাঁর প্রিয়তমা দুহিতা ফাতিমাকে হজরত আলীর সঙ্গে বিয়ে দেন। আলী ও ফাতিমার দুই পুত্রসন্তান হাসান ও হোসাইন নবীর জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর কোলে-পিঠে স্নেহের পরশে বড় হয়ে ওঠেন। তাঁরা ব্যতিরেকে মহানবীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে তাঁর বংশধারা অব্যাহত রাখার আর কেউ বেঁচে ছিলেন না। এমনি অবস্থায় মদীনায় ইসলামকে একটি বিপ্লবী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে মুহাম্মদ (সা) ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ৮ই জুন (হিজরী ১১ সালের ১২ই রবিউল আউয়াল) সোমবার ওফাত লাভ করেন।

হজরতের ইসলাম প্রচারকালে কুরাইশ বংশের অপর শাখা শত্রুতাবশত নবী ও ইসলামের তীব্র বিরোধিতা করেন। বস্তুত, তারাই ইসলাম বিরোধিতায় সমগ্র পৌত্তলিক আরবের নেতৃত্ব দিয়েছিল। একমাত্র হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান ছাড়া আর কোন নামকরা উমাইয়া গোত্রীয় ব্যক্তি হজতের মক্কাবিজয়ের পূর্বে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নি। উমাইয়া বংশের প্রথম খলিফা মুয়াবিয়ার পিতা আবু সুফিয়ান ওহুদের যুদ্ধে কাফিরদের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তাঁর স্ত্রী হিন্দা সেই যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা হামজা (রা) শহীদ হলে তাঁর লাশ নিয়ে এক পৈশাচিক দৃশ্যের অবতারণা করে। আবু সুফিয়ান ও হিন্দা তাঁদের সন্তান মুয়াবিয়াকে নিয়ে মক্কাবিজয়ের পর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। হযরতের বিশাল নেতৃত্বের গুণে চিরশত্রু বনী হাশিম আর বনী উমাইয়া সাময়িকভাবে নিজেদের শত্রুতা ভুলে গিয়ে ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করে। মুয়াবিয়া নিজেই হজরতের প্রিয় সাহাবী হিসেবে কাতেবে ওহীর মর্যাদা লাভ করেন।

মহানবীর ওফাতের পর তাঁর উত্তরাধিকারিত্ব নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্নমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনা হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, রাসূলের কোন পুত্র সন্তান ছিল না এবং তিনি কাকেও খলিফা মনোনীত করে যান নি। নানারকম

বাক-বিতণ্ডার নিরসন করে মুহাজিরদের মধ্যে উমর এবং আনসারদের মধ্যে আবু উবায়দা কুরাইশদের মধ্যে প্রবীণ ও বিজ্ঞ আবুবকরের হস্তে বয়অত হন। সকল দল সন্তুষ্ট না হলেও গৃহবিবাদ বন্ধ হল। রাসূলের প্রিয় জামাতা হজরত আলী নির্বাচনস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। মাত্র আড়াই বছর সাফল্যের সাথে ইসলামের খেদমত করে হজরত আবু বকর ২৩শে আগস্ট, ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে (১৩ হি. ২২শে জমাদিউসসানী) ইন্তেকাল করেন এবং চিরবিদায়ের আগে তিনি প্রধান প্রধান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সম্মতি এবং পরামর্শ গ্রহণ করে হজরত উমরের স্কন্ধে খিলাফতের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন।

কঠোর কর্তব্যপরায়ণতা, সূক্ষ্মবিচারবুদ্ধি এবং অসীম ক্ষমতার সাথে দশ বৎসর পাঁচ মাস খিলাফতের গুরুদায়িত্ব বহন করে তৎকালীন পরিচিত দুনিয়ার অর্ধেকেরও বেশি পরিসরে ইসলামের বিস্তার সাধন করে হজরত উমর এক আততায়ীর হস্তে নিহত হন (৬৪৪ খ্রি.)। মৃত্যুর পূর্বে তিনি হজরত উসমান, আলী, তালহা, যুবায়র, সাদ এবং আবদুর রহমান এ ছয় জন প্রবীণস্থানীয় ব্যক্তির উপর তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করে যান। কয়েকদিন ধরে দরবার ও বাক্‌বিতণ্ডার পর আলী ও উসমানের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিতর আবদুর রহমানের মধ্যস্থতায় উসমান তৃতীয় খলিফা পদে নির্বাচিত হন।

জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও সহজ সরল বয়োবৃদ্ধ জুন্নরাইন[১৯] উসমানের খিলাফতামলে তুলনামূলকভাবে বৈষয়িক স্বার্থপূজারী উমাইয়াগণ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তিনি তাঁর জ্ঞাতিগোষ্ঠীর হাতের ক্রীড়নক হয়ে পড়েন। প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ উমাইয়াদের দখলে চলে যায়। খলিফার খুল্লতাত ভ্রাতা মারোয়ান খলিফার সচিব নিযুক্ত হন। তাঁর ষড়যন্ত্র ও কূটনীতির ফলে খলিফা বার বার ভুল করতে লাগলেন। কালক্রমে সারা দেশব্যাপী বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। রাসুলের ব্যক্তিত্ব প্রভাবে বনী হাশিম ও বনী উমাইয়াদের ভুলে যাওয়া সুপ্ত শত্রুতা উসমানের সহযোগীদের ষড়যন্ত্র ও কুশাসনে আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। কিন্তু মহানুভব ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আলী খলিফাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে লাগলেন। উসমানের দুর্বলতার সুযোগ লাভ করে আশতার নাখয়ী নামক জনৈক অনারব এবং আবদুল্লাহ ইবনে সাবা (ইবন সওদা নামক ইহুদী) নামক নওমুসলিম কুফা, বসরা এবং মিশরে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হন। ইবনে সাবা হযরত আলী ও আহল-ই-বয়তের দরদী সেজে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং খিলাফতে নবীর বৈধ উত্তরাধিকার প্রচার করতে থাকে। বহু মুসলমান তার মতানুসারী হয় এবং খলিফা উসমানকে উচ্ছেদ করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। এদিকে নবনিযুক্ত প্রাদেশিক গভর্নরদের দুঃশাসনে অবস্থা এমন শোচনীয় রূপ ধারণ করল যে, মালিক

উশতুরের নেতৃত্বে এক বিদ্রোহী প্রতিনিধিদল মদীনায় পৌঁছে খলিফার নিকট প্রাদেশিক গভর্নরদের কুশাসনের প্রতিকার দাবী করল। তারা খলিফার দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতা মিশরের অত্যাচারী শাসক আবদুল্লাহ ইবন আবি সাবাহকে অনতিবিলম্বে অপসারণ করে তদস্থলে মুহম্মদ ইবন আবুবকরকে নিয়োগ দান করার জন্য চাপ দিলে খলিফা তাদের দাবী মেনে নিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মুহম্মদ ইবন আবুবকর এবং তার সহচরগণ মারোয়ানের জালকরা খলিফার শীলমোহরকৃত একখানি চিঠি পথের মধ্যে ধরে ফেললেন যাতে তাদের মৃত্যু আজ্ঞা লেখা ছিল। প্রতিনিধিদল ক্রুদ্ধ হয়ে রাজধানীতে ফিরে এসে খলিফার নিকট কৈফিয়ত তলব করেন এবং প্রমাণিত হল যে কূটবুদ্ধি মারোয়ান চিঠি জাল করেছেন। বিদ্রোহীদল মারোয়ানকে তাদের হস্তে সমর্পণের দাবী জানালে খলিফা তা প্রত্যাখ্যান করেন। তারা খলিফার বাসভবন অবরোধ করে খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। উসমানের এ বিপদে আলী, তাঁর পুত্রগণ এবং অন্যান্য রক্ষক সাহসের সাথে বিদ্রোহীদের আক্রমণ প্রতিরোধের প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু সমস্ত প্রতিরোধ উপেক্ষা করে বিদ্রোহীরা কুরআন পাঠরত অবস্থায় বৃদ্ধ খলিফাকে তরবারির আঘাতে নিহত করে (১৮ই জুলহিজ্জা, ৩৪ হি, ১৭ই জুন, ৬৫৬ খ্রি.)। তাঁর পত্নী বিবি নায়লা স্বামীকে রক্ষা করতে গিয়ে শত্রুদের তরবারির আঘাতে হাতের কয়েকটি আঙ্গুল হারিয়ে মারাত্মকভাবে জখম হন। এভাবে ইসলামের ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী বিপর্যয়কর কলঙ্কজনক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হল এবং হাশিমী-উমাইয়া শত্রুতার অনলে ঘৃতাহুতি প্রদান করা হল। ইসলামের তৃতীয় খলিফা হজরত উসমানের এরূপ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর মদীনাসহ সমগ্র মুসলিম জাহানে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। তাঁর গোত্রীয় লোকজন প্রতিশোধের অগ্নিতে জ্বলে উঠে। জনৈক ব্যক্তি বিবি নায়লার কর্তিত রক্তরঞ্জিত আঙ্গুলগুলো উসমানের রক্তসিক্ত জামায় জড়িয়ে দামেস্কে মুয়াবিয়ার নিকট নিয়ে যায়। এদিকে মদীনায় উসমানের পর কেউ খিলাফত গ্রহণে সাহসী হলেন না। ছয়দিন অতিবাহিত হবার পর জনতার অনুরোধে খলিফাশূন্য মুসলিম জাহানের দুরবস্থার কথা ভেবে হযরত আলী দায়িত্বগ্রহণে রাজি হন। তালহা ও যুবায়র প্রথমেই বয়অত গ্রহণ করলেন বটে, কিন্তু পরিণামে ঘরে-বাইরে সর্বত্র বিশৃঙ্খল অবস্থায় তাঁরা খলিফা আলীকে কোন প্রকার সাহায্য তো করলই না, বরং তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল। বনী উমাইয়াগণ সিরিয়ার শাসনকর্তা আমীল মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ এবং উসমান হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করে। আলী খিলাফতের সুশাসনের ব্রত নিয়ে সিরিয়ার শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান শাসনকর্তা মুয়াবিয়াসহ আরো কতিপয় প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে বরখাস্তের আদেশ দিলেন। কেউ ইচ্ছায়, কেউ অনিচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগ করলেও মুয়াবিয়াসহ কয়েকজন খলিফার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তাঁরা

ওসমান হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবী তুললেন। মুয়াবিয়া সিরিয়ায় এক বিরাট শক্তিশালী সৈন্যদল গঠন করলেন। তাঁর এরূপ কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য ছিল খিলাফত দখল। এদিকে তালহা ও যুবায়ের যথাক্রমে কুফা ও বসরার গভর্নরের পদ প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা মঞ্জুর না হওয়ায় তাঁরা খলিফার শত্রু হয়ে দাঁড়ান। রাসুলুল্লাহর বিধবাপত্নী বিবি আয়েশাও তাঁদের প্ররোচনায় বিদ্রোহীদের কাতারে শামিল হলেন। প্রথমে মক্কা ও পরে বসরায় তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এক বিরাট সৈন্যদল গঠিত হয়। তাঁরা বসরার খলিফার অনুগত শাসনকর্তা উসমান ইবন হানিফাকে প্রথমে কারারুদ্ধ ও পরে বিতাড়িত করেন। হযরত আলী এসব সংবাদ অবহিত হয়ে বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হলেন এবং বিদ্রোহ দমন করার জন্য সসৈন্যে বসরার দিকে অগ্রসর হলেন। খোবায়রা নামক স্থানে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হলে হযরত আলী রক্তপাত এড়াবার জন্য আপস মীমাংসার আহ্বান জানালে তালহা যুবায়ের ও হযরত আয়েশা সম্মত হন। কিন্তু আলীর দলে অবস্থানকারী উসমান হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা মালিক উশতুরের নেতৃত্বে খলিফার অজান্তে রাতের আঁধারে অতর্কিতে যুবায়েরী সৈন্যদের উপর আক্রমণ করে বসে। ফলে উভয় পক্ষের সৈন্য ঘোরতর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন এবং পরস্পরকে প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। যুদ্ধে তালহা ও যুবায়েরসহ অসংখ্য মুসলমান নিহত হলেন এবং বিবি আয়েশা ধৃত হলে হযরত আলী তাঁকে পূর্ণ মর্যাদার সাথে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। বিবি আয়েশা একটি উষ্ট্রের পিঠে আরোহণ করে যুদ্ধ করেছিলেন বলে ইসলামের ইতিহাসে এ প্রথম গৃহযুদ্ধ 'উষ্ট্রের যুদ্ধ' বা 'জঙ্গে জমল' নামে খ্যাত।

জমলের যুদ্ধের পর খলিফা আলী কিছু সুবিধা বিবেচনা করে খিলাফতের রাজধানী মদীনা থেকে কুফায় স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু এ কাজে শেষ পর্যন্ত তাঁর মঙ্গলের চাইতে অমঙ্গলই বেশি হয়েছিল। মুয়াবিয়া ক্রমান্বয়ে আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। কূটনীতিগুণে তিনি আলীর বিশ্বস্ত সেনানায়ক মিশরের শক্তিশালী শাসনকর্তা কয়সকে অপসারণ করান এবং আমর ইবন আসের মত জাঁদরেল কূটনীতিককে স্বপক্ষে লাভ করেন। আলী এবং মুয়াবিয়ার সৈন্য বাহিনী রণসাজে সজ্জিত হয়ে ফোরাত নদীর তীরে সিফফিনের প্রান্তরে মুখোমুখী হন। এবারও হজরত আলী রক্তপাত এড়াবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। উভয় পক্ষে এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী লড়াই সংঘটিত হয়। এটিই ইসলামের ইতিহাসে 'সিফফিনের যুদ্ধ' (৬৫৭ খ্রি.) নামে খ্যাত। তিনদিন যুদ্ধের পর পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে মুয়াবিয়ার সৈন্যরা আমরের পরামর্শে পতাকা ও বর্শার অগ্রভাগে কুরআন শরীফ ঝুলিয়ে মীমাংসা কামনা করলেন। আলী শত্রুদের ছলতাচাতুরী বুঝতে পেরে নিজ বাহিনীকে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। তাঁর কুফী বাহিনী আর যুদ্ধ না করে কুরআনের মীমাংসা মেনে নেবার জন্য তাঁকে চাপ দিলেন। অগত্যা বিজয়

লাভের পূর্বমুহূর্তে তিনি যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হন। মুয়াবিয়ার পক্ষে চতুর আমর আর আলীর পক্ষে বৃদ্ধ ও সরল আবু মুসা আশারী শালিশ মনোনীত হলেন। আমর আবু মুসাকে বুঝালেন যে, রাষ্ট্রের অশান্তির জন্য আলী ও মুয়াবিয়া উভয়ই দায়ী। কাজেই উভয়কে পদচ্যুত করে অন্য একজনকে খলিফা নির্বাচিত করলে রাষ্ট্রের মঙ্গল হবে। প্রতিনিধিদ্বয় শলা-পরামর্শ করে সভাস্থলে এসে প্রথমে বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে আবু মুসা আশারী বললেন, তিনি শান্তির খাতিরে আলীর প্রতিনিধি হিসেবে আলীর খিলাফতের দাবী রদ করছেন। অতঃপর ধুরন্ধর আমর বললেন যে, আবু মুসা আলীকে খিলাফতের আসন থেকে পদচ্যুত করেছেন তদস্থলে তিনি (আমর) মুয়াবিয়াকে নতুন খলিফা মনোনীত করছেন। আমরের এ ঘোষণায় আলীর লোকজন অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হল এবং পরস্পর বিরুদ্ধ দু'টি দল প্রতিশোধ গ্রহণের কথা বলাবলি করতে করতে স্থান ত্যাগ করল। প্রবঞ্চনাপূর্ণ শালিশী দ্বারা বিবাদের মীমাংসা হল না। মুয়াবিয়া কিছুতেই আলীর বশ্যতা স্বীকার করলেন না। এদিকে সিফ্‌ফিনের শালিশের প্রতিবাদে সৃষ্ট খারিজীদেরকে হজরত আলী একাধিকবার পরাজিত ও পাইকারী হত্যার পরও নিঃশেষ করতে পারলেন না। অবশেষে খারিজীরা মুসলিম জাহানের অশান্তির মূল কারণ আলী, মুয়াবিয়া আর আমরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। সৌভাগ্যক্রমে মুয়াবিয়া ও আমর রক্ষা পেলেও খারিজী আবদুর রহমান ইবনে মুলযমের অব্যর্থ আঘাতে কুফার মসজিদে হজরত আলী দেহ ও মাথায় গুরুতরভাবে আহত হন। ফলে ইসলামের ভবিষ্যৎকে আরও তমসাবৃত করে ৪০ হিজরীর ১৭ই রমজান (৬৬১ খ্রি. ২৭শে জানুয়ারি) ৬৩ বৎসর বয়সে হযরত আলী পরলোকগমন করেন। তারই সাথে ইসলামের খোলাফায়ে রাশেদুনের যবনিকাপাত ঘটে।

হজরত আলীর শাহাদাতের পর ইমাম হাসান কুফার খলিফা নির্বাচিত হন। ঐদিকে সিরিয়ায় মুয়াবিয়া নিজেকে সমগ্র মুসলিম জাহানের খলিফা বলে ঘোষণা করলেন। কুফায় অস্থিরমতি জনগণ আলীর ন্যায় ইমাম হাসানের জন্যও বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। কুফার বিশৃঙ্খলার সুযোগে মুয়াবিয়া ইরাক তথা ইমাম হাসানকে আক্রমণ করে বসেন। হাসান বিচক্ষণ সেনাপতি কয়েসকে বহু সৈন্যসহ মুয়াবিয়ার গতিরোধ করতে পাঠালেন এবং স্বয়ং মাদাইন অভিমুখে অগ্রসর হলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইরাকী সৈন্যদলের বিশ্বাসঘাতকতায় ইমাম হাসান অত্যন্ত বিব্রত হয়ে কুফায় প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি মুয়াবিয়ার সাথে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে তাঁর সপক্ষে খিলাফতের দাবী পরিত্যাগ করেন। চুক্তি অনুযায়ী মুয়াবিয়া আজীবন খলিফা থাকবেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর ইমাম হাসানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইমাম হোসাইন মুয়াবিয়ার স্থলাভিষিক্ত হবেন। স্থিরীকৃত হল যে মুয়াবিয়া ইমাম হাসানকে জীবৎকাল পর্যন্ত যথোপযুক্ত পেন্সন এবং পারস্যের

একটি জেলার সম্পূর্ণ রাজস্ব প্রদান করবেন। হাসান মদীনা গমন করলে মদীনাবাসী তাঁদের ধর্মীয় জীবনে তাঁকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করলেন। মুয়াবিয়া এবার সমগ্র মুসলিম জাহানের খলিফা হিসেবে জনসাধারণের স্বীকৃতি লাভ করলেন। তিনি দামেস্কেই সমগ্র মুসলিম জগতের রাজধানী করলেন। খোলাফায়ে রাশেদুনের আদর্শ হতে বিচ্যুত হলেও কঠোর প্রকৃতি আর মুয়াবিয়ার সুদক্ষ পরিচালনায় সুবিস্তৃত রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে। সিংহাসন নিষ্কণ্টক করবার জন্য তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে বিষপ্রয়োগে অথবা গুপ্তঘাতক দ্বারা হত্যা করতে কুণ্ঠিত হতেন না। হযরত আলীর বিখ্যাত সেনাপতি মালিক উশ্‌তুরকে তিনি বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন এবং ইমাম হাসানকে তিনি একই ভাবে পৃথিবী হতে অপসারিত করেন।[২০] ঐতিহাসিক মাসউদী তাঁর *মুরুজুজ জাহাব* গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডের ২-৩ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন যে, ইমাম হাসানের এক স্ত্রী কর্তৃক তিনি বিষপ্রয়োগে নিহত হন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না বলে নাম বলতে অস্বীকার করেন।

বৃদ্ধ বয়সে খলিফা মুয়াবিয়া বসরার শাসনকর্তা মুঘিরার পরামর্শে, ইরাকের শাসনকর্তা যিয়াদ ইবনে আবিহির সমর্থন নিয়ে ইমাম হাসানের সঙ্গে আবদ্ধ চুক্তি ভঙ্গ করে পুত্র ইয়াযিদকে খিলাফতে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। সিরিয়াবাসীগণ তো আগেই তাঁর মতানুসারী। আর মক্কা ও মদীনা গমন করে সমর্থন আদায়ের প্রচেষ্টা চালালে বিশিষ্ট চারজন ব্যতিরেকে আর সকলেরই সমর্থন লাভ করেন। এ চারজন (হোসাইন ইবনে আলী, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর এবং আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর) কাকেও সমর্থন জানাতে অস্বীকৃতি জানালেন। এরূপ অবস্থায় ৬৮০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে (৬০ হি.) প্রায় পঁচাত্তর বছর বয়সে মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর ইন্দ্রিয়পরায়ণ পুত্র ইয়াযিদ দামেস্কের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে মুয়াবিয়া পুত্রকে হোসাইন ইবনে আলীর সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করবার পরামর্শ দেন। বিচক্ষণ প্রশাসনিক কলা-কৌশল এবং বিভিন্ন প্রদেশের শাসনসংক্রান্ত নীতি সম্পর্কেও তিনি পুত্রকে উপদেশ দিয়ে যান। খিলাফত গ্রহণ করেই ইয়াযিদ শাসনকার্যে মনোনিবেশ করতেই যে-কয়জন তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেনি তাঁদের প্রতি মনোযোগ দেন। মদীনার শাসনকর্তা ওলিদ ইবনে ওতবার নিকট পত্র প্রেরণ করা হলো উপরোক্ত ব্যক্তিদের বশ্যতার স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য। ওলিদের কার্যকলাপে ইমাম হোসাইন এবং ইবনে যোবায়ের মদীনা ত্যাগ করে মক্কা গমন করেন। কুফাবাসীরা হজরত আলী এবং ইমাম হাসানের সঙ্গে কপট আচরণ করলেও কুফীদের অন্তরে বরাবরই আহল-ই-বায়তের প্রতি একটা টান যে ছিল তা অস্বীকার করা যাবে না। কাজেই ইমাম হোসাইনের সমর্থকগণ ইমামকে কুফা আগমনের জন্য বহু চিঠিপত্র

ও দেখা-সাক্ষাতের মাধ্যমে অনুরোধ জানাল এবং তাঁকে খলিফা হিসেবে বরণ করার ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিল। তিনি ইয়াযিদের দুঃশাসন হতে মুসলিম জাহানকে উদ্ধার এবং নিজেকে রাসুলুল্লাহর একজন উত্তরাধিকারী মনে করে কুফার বিশ্বাসঘাতক শীয়াদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। অবশ্য তিনি শুভাকাঙক্ষীদের পরামর্শ মত পিতৃব্যপুত্র মুসলিম ইবনে আকীলকে যথার্থ সংবাদের জন্য কুফায় দূত হিসেবে প্রেরণ করেন। মুসলিম কুফা পৌঁছে দেখেন যে, কুফার জনমত হোসাইনের অনুকূলে। কাজেই কুফার শাসনকর্তা নোমান ইবনে বশীরসহ সকলের সমর্থনের কথা জানিয়ে মুসলিম ইমাম হোসাইনকে কুফা আগমনের জন্য পত্র প্রেরণ করেন। পত্র পেয়েই ইমাম কাল বিলম্ব না করে কিছুসংখ্যক আত্মীয় বন্ধুসহ সপরিবারে কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে মক্কা থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার পর পরই কুফার রাজনৈতিক অবস্থার পটপরিবর্তন ঘটে। নোমানের ঔদাসীন্য এবং হোসাইনের পক্ষে জনমতের সংবাদ জ্ঞাত হয়ে খলিফা ইয়াযিদ তৎক্ষণাৎ নোমানকে পদচ্যুত করে বসরার শাসনকর্তা নিষ্ঠুর উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করলেন। উবায়দুল্লাহ কুফা গমন করে সর্ববিধ বিষয় অবগত হয়ে অনুসন্ধান করতঃ হানী নামক আহল-ই-বয়তের জনৈক ভক্তের গৃহ থেকে মুসলিম ইবনে আকীলকে বের করে হানী ও মুসলিম উভয়ের শিরচ্ছেদ করেন। তিনি ছলে বলে কৌশলে উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করে বশে আনতে সমর্থ হন এবং কুফার সকলে আবার ইয়াযিদের পক্ষে যোগদান করেন। এদিকে ইমাম হোসাইন শুভাকাঙক্ষীদের বারণ অগ্রাহ্য করে এক ক্ষুদ্র কাফেলা সঙ্গে নিয়ে কুফা অভিমুখে এগিয়ে আসেন। মরুভূমির প্রচণ্ড উত্তাপ আর নানাবিধ সমস্যার মাঝে তিনি কাদেসিয়া নামক স্থানে এসে মুসলিমের নিধনসংবাদসহ কুফার সমস্ত খবরাকবর অবগত হলেন। তাঁর ক্বাফেলায় নিরপরাধ শিশু, মহিলা আর কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর ছাড়া আর কেউ ছিল না। এমতাবস্থায় তিনি নিরীহ ব্যক্তিগণের প্রাণ বাঁচাবার নিমিত্ত ফিরে যেতে চাইলেন। কিন্তু মুসলিমের সন্তানগণ আর আত্মীয়-স্বজন প্রতিবাদ করে জানালেন যে, তাঁরা মুসলিমহত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে কিছুতেই ফিরবেন না। অগত্যা ইমাম হোসাইন মন্ত্রমুগ্ধের মত সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকলেন। পথিমধ্যে কবি ফরাযদাকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তাঁকে কুফার খবর জিজ্ঞাসা করেন। কবি জবাব দেন যে, কুফার মানুষের অন্তঃকরণ আপনার (হোসাইনের) সঙ্গে, কিন্তু তাদের হাত তথা অস্ত্র ইয়াযিদের (ভয়ে) পক্ষে। সমূহ বিপদাশঙ্কায় মক্কা থেকে আগত কিছু বেদুইন তাঁর অনুমতি গ্রহণ করে দলত্যাগ করে চলে গেল। শেষ পর্যন্ত তাঁর দলে মাত্র ত্রিশজন অশ্বারোহী এবং চল্লিশজন পদাতিক সৈন্য রইল। কাফেলা কাদেসিয়া পার হলে হোসাইন দেখতে পেলেন যে, হোর নামক ইয়াযিদের জনৈক সেনাপতি সহস্রাধিক সৈন্যসহ তাঁকে অনুসরণ

করছে। হোর উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের আদেশে ইমাম হোসাইনকে অনুসরণ করলেও আহল-ই-বয়তের প্রতি তাঁর টান ছিল বলে ইমামের সাথে পত্র বিনিময় করেন এবং কুফার সমস্ত ঘটনার বিবরণ জানিয়ে দেন। ইমাম কুফীগণের বিশ্বাসঘাতকতা ও মতপরিবর্তনের সংবাদ জেনে মর্মপীড়িত হলেন। অবশেষে পথশ্রান্ত ঘর্মাক্ত কলেবর ক্ষুদ্র কাফেলা ফোরাত নদীর পশ্চিম তীরবর্তী কারবালা প্রান্তরে এসে শিবির স্থাপন করলেন (২রা মহররম, ৬১ হি.)। উবায়দুল্লাহ কর্তৃক ওমর ইবনে সাদের নেতৃত্বে চার হাজার উমাইয়া সৈন্য এ ক্ষুদ্র কাফেলাকে অবরোধ করল। উবায়দুল্লাহর নির্দেশ ছিল ফোরাত নদীর উপকূল ভাগ ঘিরে রেখে হোসাইনের শিবিরে পানিসংগ্রহের পথ বন্ধ করে কষ্ট প্রদানপূর্বক ইয়াযিদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করা। ওমরের সৈন্যরা তাই করল। একেতো মরুভূমির প্রচণ্ড উত্তাপ তদুপরি সকলে ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত ও অবসন্ন। পানির অভাবে সকলে হাহাকার করে উঠল। ইমাম হোসাইন অনন্যোপায় হয়ে ওমর ইবনে সাদের নিকট তিনটি সম্মানজনক প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাব তিনটি হল: প্রথমত, ইমাম হোসাইন যেখান থেকে এসেছেন (মক্কা) সেখানে ফিরে যাবেন। দ্বিতীয়ত, দামেস্কে খলিফা ইয়াযিদের নিকট বোঝাপড়া করার নিমিত্ত তাঁকে যেতে দেওয়া হউক। তৃতীয়ত, ধর্মপ্রচারের জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্য তাঁকে কোন দূরবর্তী এলাকায় প্রেরণ করা হউক। ওমর প্রস্তাব তিনটি উবায়দুল্লাহর কাছে পেশ করলে নিষ্ঠুর উবায়দুল্লাহ সেটা নাকচ করে দেন। উবায়দুল্লাহ বলে পাঠালেন যে, তাঁকে (ইমাম হোসেনকে) বিনা শর্তে ইয়াজিদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য কর, নচেৎ তাঁর সাথে যুদ্ধ করে তাঁর শিরচ্ছেদ কর এবং শির কুফায় প্রেরণ কর। ইমাম হোসাইন উবায়দুল্লাহর কঠোর আদেশ শ্রবণপূর্বক সিদ্ধান্ত নিলেন যে, দুষ্কর্মশীল ইয়াজিদের বশ্যতা স্বীকার অপেক্ষা প্রকৃত ধর্মবীরের ন্যায় সম্মুখ যুদ্ধে জীবন বিসর্জন দেওয়া উত্তম। ওমর হোসাইনকে পরামর্শ দিলেন যে, খলিফা ইয়াযিদের বশ্যতা স্বীকার করলে তাঁর কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা নেই। কিন্তু ইমাম তা না করে জানালেন যে, শুধু তাঁর (হোসাইনের) জীবন নিয়ে নিরপরাধ পরিবার পরিজন ও অনুচরদের নির্বিঘ্নে স্থানত্যাগ করতে অনুমতি দেওয়া হোক। কিন্তু ওমর তাতে কর্ণপাত করলেন না। হোসাইন বিপদের গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করে বন্ধুবান্ধব ও অনুচরদেরকে সময়মত আত্মরক্ষা করার জন্য কারবালা পরিত্যাগ করবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু ভক্ত অনুচরগণ তাঁকে ছেড়ে চলে যেতে রাজি হলেন না।

কার্যসম্পাদনে বিলম্ব হচ্ছে দেখে উবায়দুল্লাহ শিমার ইবনে যিলজোশান নামক এক দুর্বৃত্তকে মৌখিক আদেশ দিয়ে কারবালায় পাঠালেন এই বলে যে, হোসাইনকে অনতিবিলম্বে জীবিত কিংবা মৃত যেকোন অবস্থায় কুফায় প্রেরণ করতে হবে। তিনি আরো নির্দেশ দিলেন যে, যদি ওমর তাঁর আদেশ অনুসারে কাজ না করে

তাহলে শিমার যেন তাঁকে পদচ্যুত করে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ইমাম হোসাইন তখনও পবিত্র কোরান শত্রুদের নিকট প্রদর্শন করে সন্ধিপ্রার্থনা করলেন। কিন্তু তা অগ্রাহ্য হল। ৬১ হিজরী সনের (৬৮০ খ্রি.) ১০ই মহরম তারিখের প্রাতঃকালে উভয় পক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো। এ সময় ইয়াযিদ বাহিনীর ৩৭ জন সৈন্যসহ হোর নামক জনৈক সেনাপতি ইয়াযিদ ব্যূহ হতে নির্গত হয়ে ইমামের দলে যোগদান করলেন। হোসাইনের মাত্র বাহাত্তর জন পিপাসাকাতর সৈন্য এক এক করে শত্রুদের এক এক জনের সাথে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে মরতে থাকলেন। মল্লযুদ্ধে পিপাসাকাতর অভুক্ত অর্ধভুক্ত মাদানী সৈন্যদের অমিততেজ দেখে শত্রুরা আর সামনে আসতে সাহস করল না। দূর থেকে তীর নিক্ষেপ করতে লাগল। কিন্তু এ ক্ষুদ্র বাহিনী বেশীক্ষণ টিকতে পারল না। অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুদের সাথে তাঁর পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ যুদ্ধ করে তাঁর সম্মুখেই শহীদ হলেন। তাবুর মধ্যে তাঁর হস্তের উপর তাঁর শিশুপুত্র তীরের আঘাতে প্রাণত্যাগ করলেন। পুরুষগণের মধ্যে (একমাত্র রুগ্ন পুত্র জয়নুল আবেদীন ব্যতীত একে একে প্রায় সকলেই শাহাদাৎ বরণ করলে ইমাম হোসাইন স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কেউই তাঁর নিকটবর্তী হতে সাহস পায়নি। মহাবীর ইমাম হোসাইন প্রাণপণে যুদ্ধ করে ক্ষুৎপিপাসা ও ক্লান্তিতে কাতর হয়ে পড়লেন। তাঁর সমস্ত শরীর তীর ও অস্ত্রের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হল। প্রচুর রক্তক্ষরণে তিনি দুর্বলদেহে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন। শত্রুগণ তাঁকে চতুর্দিক হতে ঘিরে ফেলে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল এবং তাঁর শির দেহচ্যুত করল। কর্তিত শির বর্শাগ্রে গেঁথে তুলে নিল। অতঃপর তাঁর দেহ অশ্বপদ তলে দলিত করে তারা চরম নৃশংতা প্রদর্শন করল। এ নৃশংসতম ঘটনাই ইসলামের ইতিহাসে 'কারবালার হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত। হোসাইনের পুত্র আলী (জয়নুল আবেদীন) রোগাক্রান্ত অবস্থায় শিবিরের মধ্যে পড়েছিলেন। মহিলাদের ক্রন্দন ও করুণ বিলাপে কারবালা রণপ্রান্তর ভারাক্রান্ত হল। অতঃপর জয়নুল আবেদীনসহ তাঁদের সকলকে কুফার উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের নিকট প্রেরণ করা হল। এ যুদ্ধে হোসাইন পক্ষীয় বাহাত্তর জন আর ইয়াযিদ পক্ষীয় অষ্টাশী জন সৈন্য নিহত হয়। এ মর্মান্তিক ঘটনা সম্পর্কে আল ফাখরী নামক জনৈক আরব ঐতিহাসিক লিখেছেন, "This is Catastrophe whereof I care not to speak at length as it is too grievous and horrible. For, verily it was a catastrophe than which naught more shameful hath happened in Islam."—Al Fakhri. "ইহা এমন একটি শোচনীয় ঘটনা যার সম্বন্ধে বেশি কিছু বলিতে আমার মন সরে না, কেননা ইহা একটি চরম দুঃখদায়ক এবং লোহহর্ষক ব্যাপার। নিশ্চয়ই ইহা এমন একটি বেদনাকর ঘটনা যার চাইতে অধিক লজ্জাজনক আর কিছু ইসলামে ঘটে নাই।"[২১]

হোসাইনের শির কারবালা থেকে কুফার শাসনকর্তা উবায়দুল্লাহর নিকট হাযির করা হলে তিনি ছিন্ন মস্তকের মুখমণ্ডলের উপর একখানা যষ্টিদ্বারা আঘাত করলেন। এ অমানুষিক দৃশ্য অবলোকন করে জনৈক শ্মশ্রুমণ্ডিত মুসলমান চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন, হায়! এ ওষ্ঠ দুটির উপর আমি আল্লাহর রাসুলের ওষ্ঠ দুটি স্থাপিত হতে দেখেছি।" অতঃপর উবায়দুল্লাহ ইমাম হোসাইনের রুগ্ন ও জীবিত পুত্র আলীর (জয়নুল আবেদীন) সাথে পরিবারের মেয়েদের পাঠিয়ে দিলেন দামেস্কে খলিফা ইয়াযিদের নিকট; তাঁদের পাহারাদার সৈন্যরা হোসনের শির বয়ে নিয়ে গেল। শিমার সগর্বে পুরস্কার ও প্রশংসার আশায় হোসাইনের শির ইয়াযিদের সম্মুখে স্থাপিত করলে তিনি চমকে উঠলেন। পুরস্কার 'দূরে থাকুক, তার প্রতি নিদারুণ তিরস্কার ও ঘৃণা প্রকাশ করলেন। অসহায় বন্দিনীদের মাতম এবং ক্রন্দনে রাসুল ভক্তমাত্রেরই হৃদয় স্পর্শ করল। তাঁদের শোকময় কান্নায় ইয়াযিদ ভয় পেয়ে গেলেন। জনমত বিস্ফোরণ ঘটার আশঙ্কায় ইবনে যিয়াদের ঘৃণিত কার্যের জন্য তাকেও কঠোর ভাষায় ভৎর্সনা করলেন এবং তাঁদেরকে দ্রুত ভালভাবে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। হোসাইনের শির তাঁদের হাতে হস্তান্তর করা হলে তা কারবালায় নিয়ে গিলে হোসাইনের শবদেহের সাথে দাফন করা হয়। অন্য বিবরণে দেখা যায় রাত্রির অন্ধকারে হোসাইনের শির গোপনে দামেস্ক হতে বাইরে প্রেরণ করা হল এবং সিরিয়ার উত্তর পূর্বাঞ্চলে আসকালান নামক স্থানে গোর দেয়া হল।[২২] মোটামুটি এটাই হচ্ছে কারবালার প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা।

'বিষাদসিন্ধু'র কাহিনীর ঐতিহাসিকতা :

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে সাধারণ পাঠক সমাজ কেউ কেউ 'বিষাদসিন্ধু'কে ইতিহাস আবার কেউ কেউ ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা দিয়ে থাকেন। ইতিহাসের প্রতিষ্ঠিত গবেষকও এ গ্রন্থকে ইতিহাসের (Historcal Works) অন্তর্ভুক্ত করেছেন। প্রফেসর সুফিয়া আহমেদ তাঁর *Muslim Community in Bengal* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "Bishad-Sindhu or the Ocean of Grief is the title of a book published in Bangali by the corinthion' press, the author is Meer Mosharraf Hossain, an Honarary Magistrate. In this book the author has under taken to write a history of the Mohurrum, being nothing more than the recital of the tragic event of the massacre of Hussein of the plains of Karbal—The main facts are taken from various Persian and Arabic works, and the author has endeavoured to given a faittful and detailed account of the tragedy.[২৩] প্রফেসর সুফিয়া আহমেদ গ্রন্থকারের একটি বিবৃতির দ্বারা যথেষ্ট

প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে হয়। মীর সাহেব 'বিষাদসিন্ধু'র মুখবন্ধে বলেছেন, "পারস্য ও আরব্য গ্রন্থ হইতে মুল ঘটনার সারাংশ লইয়া 'বিষাদসিন্ধু' বিরচিত হইল"। কিন্তু সমালোচক[২৪] এ কথা অবিশ্বাস্য বলে মনে করেন। লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে এই যে মীর সাহেব সেসব গ্রন্থগুলোর নাম কোথাও উল্লেখ করেন নি। মশাররফ হোসেনের আরবী ফারসীতে পর্যাপ্ত দখল ছিল বলে জানা যায় না। এ কারণে মনে হয় যে, গ্রন্থটির কাহিনী কেন্দ্র মিশ্র ভাষা রীতির পুঁথিসাহিত্য। কাজী আবদুল ওদুদ বলেন, "পুঁথি সাহিত্যের লেখকদের সঙ্গে 'বিষাদসিন্ধু' লেখকের বড় মিল।[২৫] অপর একজন সমালোচক মনে করেন, 'বিষাদসিন্ধু'র কাহিনীর উৎস 'জঙ্গনামা' শ্রেণীর পুঁথি।[২৬] এ প্রসঙ্গে কায়কোবাদ স্পষ্ট করে বলেন, "মীর সাহেবের দোষ, তিনি কারবালার সেই হৃদয় বিদারক ঘটনা সম্বন্ধে পারসী ও আরবী গ্রন্থ আলোচনা ও যথার্থ অনুসন্ধান ও উপযুক্তরূপ গবেষণা না করিয়াই কেবল সেই সব উর্দু ও বাঙ্গালা গ্রন্থকারদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন মাত্র। তাঁরার 'বিষাদসিন্ধু' উর্দু 'আসাসেরাস শাহাদাতায়েন', বাঙ্গালা 'জঙ্গনামা', 'শহীদে কারবালা' ও 'মোক্তাল হোসেন' প্রভৃতি পুঁথিগুলির অনুসরণ ও সাধু ভাষায় নতুন সংস্করণ মাত্র"।[২৭]

ইসলামের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় খলিফা হযরত আলীর পুত্রদ্বয় হাসান ও হোসাইনের সঙ্গে উমাইয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়ার একমাত্র পুত্র ও উত্তরাধিকারী ইয়াযিদের দ্বন্দ্ব, কারবালা প্রান্তরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং ইমাম হাসান-হোসাইনের করুণ মৃত্যু কাহিনী 'বিষাদসিন্ধু' গ্রন্থে বর্ণিত মূল বিষয়। এ বিরোধ রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বমাত্র, একথা ঐতিহাসিক সত্য। অবশ্য এ মূল ঘটনার সঙ্গে গ্রন্থটিতে অসংখ্য শাখাকাহিনী, উপকাহিনীর সন্নিবেশ ঘটেছে। মূল ঘটনার ঐতিহাসিক সত্যতা থাকলেও গ্রন্থটিতে সত্যিকার ইতিহাসের অনুসরণ করা হয় নি। ফলে গ্রন্থে অনেক অনৈতিহাসিক ও গ্রন্থকারের চরিত্র এবং অতিপ্রাকৃত ঘটনার সমারোহ লক্ষ করা যায়। ডক্টর ওয়াকিল আহমদ বলেন, "কল্পনার যথেষ্ট আশ্রয় থাকলেও এটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত। মধুসূদন যেমন পৌরাণিক কাহিনীকে আধুনিক চিন্তার বাহন করেছিলেন, মশাররফ তেমনি দোভাষী পুঁথি প্রভাবিত পৌরাণিক ঐতিহাসিক কাহিনীকে নতুন চিন্তার বাহন করেছিলেন।[২৮]

একদিকে 'বিষাদসিন্ধু'তে বর্ণিত কাহিনী অপরদিকে কারবালা যুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমিসহ যে বিশদ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে দুটোর সাথে তুলনা করলেই পাঠক কাহিনীর ঐতিহাসিকতা সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন। হযরত মুহম্মদ (সা)-এর প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র ইমাম হাসান-হোসাইন আর উমাইয়া

খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়া তনয় ইয়াযিদ সম্পর্কিত রাজনৈতিক ইতিহাসটুকুর সাথে আরো কিছু অলৌকিক ঘটনার সংমিশ্রণে মীর মশাররফ হোসেন 'বিষাদসিন্ধু' রচনা করেন।

গ্রন্থের উপক্রমণিকায় বর্ণিত হাসান-হোসাইনের করুণ মৃত্যুকাহিনী সম্পর্কে যে ভবিষ্যৎবাণী হযরত মুহম্মদ (সা) ও তাঁর শিষ্য মাবিয়াকে বিচলিত করেছিল তা এবং এজিদের জন্মবৃত্তান্ত কোন ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া যায় না। মহরম পর্বের প্রথম থেকে এজিদ জয়নাব নাম্নী এক বিবাহিতা মহিলার প্রেমে উন্মত্ত হওয়ার কাহিনী, জয়নবের স্বামী আবদুল জব্বারকে মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে স্ত্রী-পরিত্যাগে বাধ্য করা, কিন্তু জয়নাব কর্তৃক ইমাম হাসানকে পতিত্বে বরণ, জয়নাবের রূপতৃষ্ণাই এজিদের হাসানকে নির্মূল করার সংকল্পের কারণ, হাসানকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করে স্ত্রী যায়েদার পুরস্কারের আশায় দামেস্কে এজিদের দরবারে গিয়ে মৃত্যুদণ্ড লাভ এসবই অনৈতিহাসিক। ইমাম হাসানের বিষপ্রয়োগে মৃত্যু সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ আছে। কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে মারোয়ান ময়মুনা নাম্নী এক কূটনী মহিলাকে এ হীনকার্যে নিয়োজিত করেন। এ মহিলার প্ররোচনায় হাসানের দ্বিতীয়া স্ত্রী যায়েদা কর্তৃক হাসানকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করার আভাস পাওয়া যায়। কোন কোন ঐতিহাসিক ইয়াকুবীর বরাত দিয়ে বলেন, "he died at the age of forty five (669) possibly posisoned because of some harem intrigue.[২৯] হাসানের স্ত্রীদের মধ্যে যায়েদার নাম জানা গেলেও জয়নাব নাম্নী কোন স্ত্রী ছিল ইতিহাস এ কথা বলে না। হাসানের কনিষ্ঠা স্ত্রী যায়েদাকে দায়ী করা হলেও লোকচক্ষুর অন্তরালে হাসানের সোরাহীতে বিষ ঢেলেছেন যায়েদা নাকি, রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রে ময়মুনা নাম্নী কোন কূটনী মহিলা, কিম্বা কোনও উৎকোচবশীভূতা দাসী, এ তথ্য রহস্যাবৃত।[৩০] আবার এমন বিবরণও পাওয়া যায় যাতে ক্ষয় রোগে হাসানের মৃত্যু ঘটেছিল বলে সন্দেহ করা হয়।[৩১]

প্রথম খণ্ড বা মহরম পর্বের ঊনবিংশ প্রবাহ থেকে কারবালার হত্যাসম্পর্কিত অধিকাংশ তথ্যই ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। এ পর্যায়ে চরিত্রগুলোর মধ্যে এয়াযিদের মন্ত্রী মারোয়ান, কুফার শাসনকর্তা আবদুল্লাহ জেয়াদ (ওবায়ইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ), দৈত্যকার্যে কুফায় প্রেরিত মোসলেম, কারবালা যুদ্ধে এয়াযিদপক্ষীয় সেনাপতি আমর (ওমর বিন সাদ), হোসাইনের ঘাতক সীমার (প্রকৃত নাম শামীর)[৩২], হাসানের পুত্র কাসেম, হোসাইন-কন্যা সখিনা (সুকায়না),[৩৩] হোসাইনের শিশুপুত্র শরাঘাতে নিহত আলী আসগর, অসুস্থ ও একমাত্র জীবিত পুত্র জয়নুল আবেদীন, দ্বিতীয় খণ্ড বা উদ্ধার পর্বে হানিফা (হযরত আলীর এক পুত্র মুহম্মদ হানাফিয়া)[৩৪] প্রমুখ ঐতিহাসিক চরিত্র। এদের সাথে

সংশ্লিষ্ট কিছু কিছু ঘটনা ইতিহাসে পাওয়া গেলেও সমস্ত ঘটনাবলীর উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। যেমন, মুসলিম বিন আকীলের দৈত্যকার্যে প্রেরণ ইতিহাসে সর্বজনস্বীকৃত হলেও মুসলিমের দু-নাবালক পুত্রকে সঙ্গে নেয়া, মুসলিমের হত্যার পর হারেস নামক জনৈক কুফাবাসী পাঁচ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কারের লোভে মুসলিমের নাবালক পুত্রদ্বয়ের শিরোচ্ছেদ করতে চাইলে বাধা দানের কারণে হারেস স্বীয় দু-পুত্র এবং শেষে স্ত্রীকেও হত্যা করে। মোসলেমের ছেলে দুটির শিরোচ্ছেদ করে শির নিয়ে কুফার রাজদরবারে পুরস্কারের জন্য উপস্থিত হয়ে মৃত্যুদণ্ড লাভ করার কাহিনী সম্ভবত কোন কাব্য-সাহিত্য থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। যে অবস্থায় মুসলিম গোপনে দৌত্যকার্য করতে গিয়েছিলেন তাতে দুজন নাবালক পুত্রকে সঙ্গে নেয়া অযৌক্তিক। খুব সম্ভব মহররমের শোকাবহ কাহিনীকে অধিকতর করুণরসে সিক্ত করবার জন্য কাব্য-গল্পকারগণ দ্বারা এটি কল্পিত হয়েছিল। হাসানের পুত্র কাসেম হোসাইনের কন্যা সুকায়নাকে বিবাহ করেছিল বলে ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়। সে-বিবাহ যে কারবালার রণক্ষেত্রে হয়েছিল তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আবার কাসেমের মৃত্যুর পর মারোয়ানের অপবিত্র হাতের স্পর্শ থেকে রেহাই পাবার জন্য কাসেমের শবদেহের কটিদেশ থেকে খঞ্জর তুলে নিয়ে বুকে বিদ্ধ করে সখিনার আত্মবিসর্জনের যে চিত্র 'বিষাদসিন্ধু'তে অঙ্কিত হয়েছে তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সীমার নামক সৈনিক হোসাইনের হত্যাকারী ঠিকই, হোসাইনের শির প্রথমে কুফায় ও পরে দামেস্কে নীত হয়েছিল তাও ঠিক। কিন্তু হোসাইনের শির নিয়ে আজর নামক অমুসলিমের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ, শির রক্ষার নিমিত্ত আজরের স্বীয় দু-পুত্র ও নিজের আত্মবিসর্জন দেওয়া এবং শেষে আজরের স্ত্রীও সীমারের হাতে নিহত হওয়া এসব কাহিনী উদ্ভট এবং অবাস্তব। এ পর্বে ইয়াযিদ কর্তৃক হোসাইনের খণ্ডিত মস্তক নিয়ে তাঁর অসহায় ও বন্দী পরিবার-পরিজনদেরকে বিদ্রূপ করার যে বিবরণ রয়েছে তাও সত্য নয়। আরো উদ্ভট হলো শিরটি অলৌকিকভাবে উপরের দিকে উঠে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার গল্পটি। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দৃশ্যে ফেরেশতা জিব্রাইল, নবী-রসূলগণ এবং আলী ও ফাতেমার উপস্থিতি সীমাহীন কল্পনার ফসল ব্যতীত আর কিছু নয়। সত্যি কথা হলো ইবনে জিয়াদের ঘৃণিত কার্যকলাপের জন্য ইয়াযিদ তাকে এবং সীমারকে ভৎর্সনা করেন এবং ইমাম হোসাইনের শোচনীয় মৃত্যুর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। হুসাইনের শির তার বোন এবং পুত্রের নিকট ফেরত দেয়া হয় এবং পরে কারবালায় শবদেহের সাথে সমাধিস্থ করা হয়। ঐতিহাসিক এস, খুদা বখ্শ কারবালার হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে ইয়াযিদকে নির্দোষ বলে প্রমাণ করেছেন। তাঁর মতে, একটি সাধারণ হত্যাকাণ্ডকে পরবর্তী কালের লোকেরা একটি যুগান্তকারী হত্যাকাণ্ড বলে রূপ দিয়েছেন।[৩৫]

'বিষাদসিন্ধু'র তৃতীয় খণ্ড বা এজিদবধ পর্বের সমস্ত কাহিনীই কল্পনাপ্রসূত। এ পর্বে বন্দীদের দুর্দশার চিত্র, হানিফা কর্তৃক প্রতিশোধ গ্রহণ, বন্দীদেরকে উদ্ধার, অপরাধী এবং নিরাপরধ নির্বিশেষে পাইকারী হত্যাযজ্ঞ, অশ্বপৃষ্ঠে এযিদের পশ্চাদ্ধাবন করে হানিফার অলৌকিকভাবে প্রাচীরবেষ্টিত হয়ে আবদ্ধ হওয়া, এযিদের ভূ-গর্ভস্থ প্রকোষ্ঠে এজিদের আশ্রয় নেওয়াসহ যাবতীয় কাহিনীই সাজানো। ইতিহাস বলে যে, হোসাইনের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছিল মুখতার কর্তৃক ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে জেয়াদকে হত্যা করার মাধ্যমে।[৩৬] প্রকৃতপক্ষে ইয়াযিদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ সম্ভব হয়নি। অতএব সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে মহরম পর্বের কাহিনীতে কারবালার নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত কিছু চরিত্র ও ঘটনাব্যতিরেকে গ্রন্থের উপক্রমণিকা উদ্ধার পর্ব ও এজিদবধ পর্বের প্রায় সম্পূর্ণটাই অনৈতিহাসিক।

ইতিহাস না হলে 'বিষাদসিন্ধু'কে আমরা কি ধরনের রচনা বলে আখ্যায়িত করতে পারি তা বিবেচ্য। ভুল দৃষ্টিতে 'বিষাদসিন্ধু'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যেতে পারে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের পাত্র-পাত্রীদের উপস্থিত করা হয়। ব্যক্তি হিসাবে এ সমস্ত চরিত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, কিন্তু এদের জীবন সম্পর্কে বর্ণিত সমস্ত ঘটনাবলীর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা দেওয়া চলে না। অর্থাৎ উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে সত্যের সঙ্গে কিছু কল্পনা মিশ্রিত থাকতে পারে। ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাস নয়; কিন্তু ইতিহাস থেকেই এর জন্ম। এ প্রসঙ্গে Travelyan এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য : "Historical fiction is not a history, but it springs from history and reacts upon it. Historical novels even the greatest of them can not do the specific work of history; Historical fiction has done much to make history popular and give it value, for it has stimulated the historical imagination". Quoted by Jonathan Nield in his book; *A guide to the Best Historical Novels and tales* fith ed, Int XVIII উদ্ধৃত[৩৭] এ গ্রন্থে উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণ এবং মানবজীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা, হিংসা-বিদ্বেষ সবই চিত্রিত হয়েছে। আবার ইতিহাসের পটভূমিকায় সিংহাসন নিয়ে দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম, রক্তপাত, হত্যাকাণ্ড সবই আছে। ইতিহাসের চরিত্র, লক্ষণ এ সমস্ত মিলিয়ে একে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এতে এমন কিছু ঘটনার উল্লেখ আছে যেগুলোকে ইতিহাসের আলোকে বিচার করা চলে না। এমনকি বাস্তব জীবনেও সেগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা চলে। যেমন, কিছু অলৌকিক অতিপ্রাকৃত ঘটনা। এসব অতিপ্রাকৃত ঘটনা কোন উপন্যাসের উপজীব্য হতে পারে না।

এখানে কারবালার যুদ্ধের মূল উৎস প্রেম। তাই 'বিষাদসিন্ধু'কে ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না।

কারবালার ধর্মীয় কাহিনী অবলম্বনে রচিত বলে সাধারণ দৃষ্টিতে 'বিষাদসিন্ধু'কে একটি ধর্মীয় গ্রন্থ বলে মনে করা যেতে পারে। গ্রাম বাংলার লক্ষ লক্ষ মুসলমান এটিকে ধর্মীয় অর্থেই মর্যাদা দিয়ে থাকেন। আবার 'বিষাদসিন্ধু' ধর্মীয় কাহিনীর আবরণে আবৃত বটে, অথচ প্রকৃতপক্ষে ধর্মগ্রন্থ নয়। অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত মুসলমান 'বিষাদসিন্ধু' পাঠে একপ্রকার ধর্মীয় চেতনা ও অনুভূতির পরিতৃপ্তি লাভ করলেও কোরান শরীফ বা হাদীস শরীফ যে অর্থে ধর্মীয় গ্রন্থ তার কোন চিহ্ন এতে নেই। এর কিছু চরিত্র ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কয়েকজন বংশধর। তাঁরা অত্যন্ত ত্রুটি-বিচ্যুতিহীন সৎ ও মহৎ ব্যক্তি এবং তাঁরা বিধাতাকে, নিয়তিকে একান্তভাবে বিশ্বাস করেন। তাঁরা জনগণের পরমশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। কিন্তু ঐতিহাসিকরা তাঁদেরকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন, মশাররফ সেভাবে চিত্রিত করেননি। এ প্রসঙ্গে ড. আনিসুজ্জামানের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য: "মশাররফ হোসেন কিন্তু ধর্মবুদ্ধি দ্বারা প্ররোচিত হয়ে উপন্যাস রচনা করতে বসেন নি; ঐতিহাসিক চেতনার দ্বারা প্রণোদিত হয়ে তো নয়ই। ... ধর্মনিরপেক্ষ প্রবল মানবিক চেতনাই মশাররফ হোসেনকে 'বিষাদসিন্ধু' রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে।"[৩৮] হরনাথপাল অতি সংক্ষেপে সুন্দরভাবে বলেছেন, 'বিষাদসিন্ধু' ঐতিহাসিক বটে, ইতিহাস নয়; সাহিত্য। এতে ধর্মপ্রাণতা আছে, সুধীজনের চিত্তবিনোদনের চেষ্টা আছে, কিন্তু নেই স্বর্গ-প্রাপ্তির প্রলোভন।[৩৯] কাহিনীবিশ্লেষণে লেখক ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে মানবিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করেছেন, এখানেই মীর মশাররফ হোসেনের অনন্যতা। অতএব দেখা গেল যে 'বিষাদসিন্ধু' ধর্মগ্রন্থ, ইতিহাস গ্রন্থ কোনটাই নয়। একে ঐতিহাসিক উপন্যাসও পুরোপুরি বলা যায় না। তাহলে 'বিষাদসিন্ধু' কি? আসলে এটি ইতিহাস, ধর্মীয় কাহিনী, উপন্যাস, সৃষ্টিধর্মী রচনা, মহাকাব্য, নাটক ইত্যাদি সাহিত্যের সর্ববিধ অংশের সংমিশ্রণে রোমান্টিক আবেগ মাখানো এক সংকর সৃষ্টি। 'বিষাদসিন্ধু'কে একটি প্রেম, ভালবাসা, আবেগ, হিংসা-বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্রের কাহিনী বলে মনে করা যায়। সাহিত্যিক মূল্য যতই থাকুক না কেন, এ গ্রন্থকে ইতিহাস পদবাচ্যে অভিষিক্ত করলে সত্যের অপলাপ হবে।

পাদটীকা ও গ্রন্থপঞ্জি

১ ড. কাজী আবদুল মান্নান, *মশাররফ রচনা সম্ভার* (৫ম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫ (জীবন বৃত্তান্ত) পৃ ৫৯

২ ড. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানদের চিন্তা চেতনার ধারা* (১ম খণ্ড), ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ ২৫৯

৩ মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (আধুনিক যুগ), চট্টগ্রাম, ১৯৬৮, পৃ ৭১

৪ ড. কাজী আবদুল মান্নান; প্রাগুক্ত, পৃ ৬৭

৫ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক পত্র (২য় খণ্ড), পৃ ১৪

৬ মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, *মীর মশাররফের গদ্য রচনা*, ১৯৭৫, ঢাকা; পৃ ১৯

৭ *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ২য় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩৬৫, পৃ ৫৯

৮ *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ১ম সংখ্যা, ১৯৫৬, ঢাকা, পৃ ৮৩

৯ *মীর মানস* ১৯৬৫, ঢাকা, পৃ ৫৫

১০ আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃ ২২১

১১ ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, *মীর মশাররফ হোসেনের জীবন ও সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৮৩

১২ ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; *সাহিত্য সাধক চরিতমালা* (১ম খণ্ড) পৃ ১৬, উদ্ধৃত গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২

১৩ আবদুল কাইয়ুম, *রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা* সমকালীন সমালোচকের দৃষ্টিতে মীর মশাররফ হোসেন, পৃ ৬৬-৬৭, উদ্ধৃত, *চারুবার্তা*, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ্য, ১২৯২)।

১৪ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৮৮৭ খ্রি., *বার্ষিক রিপোর্ট*, পৃ ৩-৪

১৫ *বঙ্গবাসী*, ২৭শে বৈশাখ ১২৯২ সাল, প্রাগুক্ত।

১৬ *ভারতী* ফালগুন ও চৈত্র, ১২৯৩ উদ্ধৃত: ডক্টর ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬৭

১৭ এ পর্যায়ে আমি ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোর নামের ক্ষেত্রে 'বিষাদসিন্ধু'তে ব্যবহৃত বানানের অনুসরণ করেছি। যেমন, হোসেন (হোসাইন); মাবিয়া (মুয়াবিয়া); এজিদ (ইয়াযিদ) ইত্যাদি।

১৮ কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত, *মশাররফ রচনা সম্ভার* (২য় খণ্ড), ঢাকা; ১৯৮০, পৃ ৫

১৯ রাসুলুল্লাহর কন্যা রুকাইয়া ও কুলসুমকে তিনি পর পর বিবাহ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন বলে তাঁকে 'জুন্নরাইন' বলা হত।

২০ Syed Ameer Ali : *A Short History of the Saracens*, P 71-72

২১ মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, *কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত*, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদিত, *মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ ৭২

২২ মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৪

২৩ Sufia Ahmad; *Muslim Community in Bengal*, 1884, Distributed by *Oxford University* Press Dacca, p 354

২৪ মুনীর চৌধুরী, *মীর মানস*, ১৯৬৫, ঢাকা, পৃ ৪৬

২৫ কাজী আবদুল ওদুদ, *শাশ্বত বঙ্গ*, দ্বিতীয় সং, ১৯৮৩, ঢাকা; পৃ ১২৪

২৬ মুস্তফা নুরুল ইসলাম, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, ১৯৬৮, রাজশাহী; পৃ ৪৩

২৭ কায়কোবাদ, *মহরম শরিফ বা আত্ম-বিসর্জন কাব্য*, ভূমিকা কৈফিয়ৎ অংশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫৬, ঢাকা, পৃ ২

২৮ ড. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬১

২৯ P. K. Hitts : *History of the Arabs*, P. 190

৩০ মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯

৩১ *এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম*, ২য় খণ্ড, পৃ ২৭৪

৩২ *এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম*, ১ম খণ্ড, পৃ ২৮৮

৩৩ W. Muir, *The Caliphate*, P. 310

৩৪ *এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম*, ৩য় খণ্ড, পৃ ৩০৭

৩৫ *The Tragedy of Karbala Facts and Legends* by S. Khuda Bakhsh, Statemen dated 29th May, 1931. উদ্ধৃত, গোলাম সাকলায়েন: *বাংলায় মর্সিয়া সাহিত্য*, ২য় সংস্করণ, ১৯৬৯, ঢাকা, পৃ ১৪৭

৩৬ R. A. Nicholson : *A Literary History of the Arabs*, 1930, London p. 198

৩৭ মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৮-৬৯

৩৮ আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত;' পৃ ২০৬

৩৯ হরনাথপাল, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদিত, *মীর মশাররফ হোসেন ও শতবর্ষে বিষাদসিন্ধু*, ১৯৯১, পৃ ১১